মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

# ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা

# ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

পরিমার্জিত ও বর্ধিত সংস্করণ

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

প্রকাশক

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা
..................................................
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
সার্বিক সহযোগিতায় ঃ রাফীক বিন সাঈদী
স্বত্ব ঃ মাহদী হোসাইন সাঈদী
প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
গ্লোবাল কর্তৃক প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৫
প্রচ্ছদ ঃ কোবা এ্যাডভারটাইজিং এন্ড প্রিন্টার্স
অক্ষর বিন্যাস ঃ শাকিল কম্পিউটার
৩২/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মুদ্রণ : আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিস দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
..................................................
বিনিময় ঃ ১০০ টাকা মাত্র।
..................................................

**IMANER OGNI PORIKKHA**
**Moulana Delawar Hossain Sayedee**
Co-Operated by **Rafeeq Bin Sayedee**
Copy : **Mahdee Hossain Sayedee**
Published by Global Publishing network
66 Paridhash Road, Banglabazer, Dhaka-1100
Frist Edition By Global : 2005 October
Four Doller (U.S) & Three Pound Only
Price : 100 taka Only

## যা বলতে চেয়েছি

আদর্শ যত সুন্দর এবং কল্যাণধর্মীই হোক না কেনো– সে আদর্শের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী সংগঠন, নেতৃত্ব ও নিষ্ঠাবান একদল কর্মীর প্রয়োজন হয়। এগুলোর সমন্বয় ব্যতীত কোনো আদর্শই অগ্রসর হতে পারে না এবং তা থেকে মানুষ কল্যাণও লাভ করতে পারে না। যে আদর্শের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সংগ্রাম করা হবে– সে আদর্শের ভিত্তিতেই নেতৃত্ব ও কর্মী গঠন করতে হবে এবং সেই আদর্শের মূল নীতিমালা অনুসারে সংগঠন পরিচালিত করতে হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ অন্যান্য নবী-রাসূল তথা আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনে আমরা দেখতে পাই, মহান আল্লাহ তা'য়ালা যখন তাঁদের ওপর ওহীর বিধান প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সাধনার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তখন সর্বপ্রথমে তাঁরা স্বয়ং ওহীর বিধান নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। যে সকল মানুষ তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, তাঁরাও মহান আল্লাহর বিধান সর্বপ্রথম নীজ জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন এবং অন্যকেও আল্লাহর বিধানের দিকে আহ্বান করেছেন। এ কাজ আঞ্জাম দিতে গিয়ে আম্বিয়ায়ে কেরাম ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে যেসব মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, তাঁরা যখন ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রসার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, তখনই সম্মুখে এসেছে মূল প্রশিক্ষণ গ্রহণের কাজ।

অর্থাৎ আদর্শ প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে যে সকল বাধা-বিপত্তি এসেছে, তা প্রবল ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করার অর্থই হলো মূল প্রশিক্ষণ গ্রহণ। ইসলামী আদর্শ যারা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ময়দানে তৎপর থাকে, তারা ময়দান থেকেই মূল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। কারণ, আবহমানকালের এটাই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম যে, যেখানেই ইসলামী আদর্শের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করা হবে, সেখানেই এই আদর্শের বিপরীত শক্তি চারদিক থেকে বিভিন্নভাবে বাধার সৃষ্টি করবে। আর বাধার সৃষ্টি হয় বলেই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে দক্ষ ও ত্যাগী নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়, জানবাজ কর্মী গড়ে ওঠে এবং মজবুত সংগঠন প্রস্তুত হয়।

ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসই বর্তমান ও ভবিষ্যতকালের ইসলামী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ঈমানকে শক্তিশালী করে এবং জীবনের প্রত্যেক দিকে প্রবল অনুপ্রেরণা যোগায়। দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সাধনা করতে গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী যুগে যে

সকল ব্যক্তিবর্গ অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাঁদের গৌরবময় ইতিহাস থেকেই সংক্ষিপ্তকারে এই গ্রন্থে কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। যেন বর্তমানকালে যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন, তাঁরা অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেন। আর এ লক্ষ্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে যথাযথ যোগ্যতার সাথে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ আঞ্জাম দেওয়ার তাওফীক এনায়েত করুন।

মহান আল্লাহর একান্ত মুখাপেক্ষী

সাঈদী

---

বক্ষে আগুন আজও আছে মোর
আমি যে অগ্নিগির।
সে অগ্নি শিখা ভীষণ
আত্ম বিস্মৃতি রেখেছে ঘিরি।
পাষাণ হয়ে পড়ে আছ আজ
হায়রে আত্ম ভোলা
তোমরা জাগিলে সারা পৃথিবী
খাইবে ভীষণ দোলা।

---

ওয়াকতে ফুরসত হায় কাহাঁ, কাম আভী বাকী হায়
নূরে তাওহীদ কা ইতমাম আভী বাকী হায়।
এখনো তোমার বাকী আছে কাজ, ফুরসৎ নাই বিশ্রামের,
পূর্ণ করিয়া জ্বালাও এবার নূরের প্রদীপ তাওহীদের।

# সূচীপত্র

# দুর্গম গিরি কান্তার মরু

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ-

লোকেরা ভেবেছে নাকি যে, ঈমান এনেছি একথা বললেই তাদেরকে বিনা পরীক্ষায় ছেড়ে দেয়া হবে। (সূরা আনকাবুত)

দুনিয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাসে মানুষ যেসব মতবাদ-মতাদর্শ ও জীবন দর্শন পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে দেখেছে অথবা যেসব আদর্শ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেছে এর মধ্যে কোনো একটি মতবাদ-মতাদর্শ ও জীবন দর্শন সর্বপ্রকার জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইসলামী জীবন দর্শনের মতো আপোষহীন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, এমন ধারণা যারা করে অথবা এসব জীবন দর্শনের কোনো একটিও ইসলামের ন্যায় মানবতার সাহায্য-সহযোগিতা করেছে কিংবা দুনিয়ার স্বৈরাচারী একনায়কদের বিরুদ্ধে অপর কোন জীবন বিধান চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছে- এমন ধারণা যারা করে তারা নিশ্চিতভাবে মারাত্মক ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত।

সুতরাং যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে, কিন্তু সর্বপ্রকারের জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সৃষ্টি করে না, মজলুমের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসে না, স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে সত্যের আওয়াজ বুলন্দ করে না- তারা নিজেদেরকে ঈমানদার বলে যতোই দাবী করুক না কোনো, তা প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ জাতীয় চরিত্রের লোকদের মুনাফিক বা নিরেট অজ্ঞ ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মের নাম নয়- এটি একটি বিশাল মতাদর্শ, একটি স্বাধীনতা আন্দোলন, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, একটি বিপ্লবী মতবাদ- এক কথায় মানব রচিত মতবাদ-মতাদর্শের বিরুদ্ধে একটি আপোষহীন সংগ্রাম। ইসলাম মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন তথা আন্তর্জাতিক জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই পৃথিবীতে আগমন করেছে।

একজন মানুষ ইসলাম কবুল করবে অথচ পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো শক্তির সম্মুখে সে মাথা নত করবে, নিজেকে করবে পদ-দলিত, অবনমিত; আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বাধ্যানুগত হবে, এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। ঠিক একইভাবে যার মন-মানসিকতায় ইসলামের আলো জ্বলবে কিন্তু সে জুলুম-অত্যাচার দেখে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে, সে জুলুম-নির্যাততন দ্বারা নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হোক বা সমগ্র বিশ্ব মানবতা, সে অন্যায় অত্যাচার তার দেশে চলুক বা দুনিয়ার অন্য কোন প্রান্তে,মতা কোন মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে তা সহ্য করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

সুতরাং দুনিয়ায় হয় ইসলাম চলবে না হয় ইসলামের বিপরীত আদর্শ চলবে। ইসলাম চললে সেখানে থাকবে নিরবচ্ছিন্ন সাধনা, অবিরাম জেহাদ, সত্য-ন্যায়, স্বাধীনাত ও সাম্যের পথে শাহাদাত লাভের জন্য অদম্য আগ্রহ। আর যদি ইসলামের খোলস পরিয়ে মানুষের মানুষের বানানো আদর্শ চলতে থাকে তাহলে সেখানে দেখা যাবে ফজিলতের ছড়াছড়ি, অজীফা, দোয়া-তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপক ছড়াছড়ি। সাধারণ মানুষ তখন এমন এক ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত হবে যে, একদিন হঠাৎ আকাশ থেকে ন্যায় ও কল্যাণের বৃষ্টি বর্ষিত হবে; স্বাধীনতা ও ন্যায়-নীতির মৃত আত্মা আপনা আপনি জেগে উঠবে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আকাশ থেকে এমন ধরনের বর্ষণ আজ পর্যন্ত হয়নি কখনো, আল্লাহর নীতি অনুযায়ী ভবিষ্যতেও তা কখনো হতে পারে না, কারণ যারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করে না, আল্লাহর ওপর আস্থা রাখে না এবং আল্লাহ তা'আর আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে প্রস্তুত হয় না, আল্লাহ কখনো তাদের সাহায্য করেন না। কোরআনে কারীমে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ–

আল্লাহ কখনো সে জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে জাতি নিজেই নিজের অবস্থা পরিবর্তনে স্বচেষ্ট না হয়। (আল কোরআন)

পূর্বেই বলেছি ইসলাম একটি বিপ্লবী মতবাদ। এ মতবাদ প্রকৃত অর্থেই যদি কারো হৃদয়-মন স্পর্শ করে, তাহলে তার মন-মস্তিষ্কে বা অর্ন্তজগতে সার্বিক বিপ্লবের সূচনা হয়। চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণায়, জীবনযাত্রায়, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তথা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয়। এমন এক বিপ্লব সাধিত হয় যে, গতকাল যে মানুষটি ছিলো অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকারী, এই বিপ্লব সাধিত হবার পরে সে বর্তমানে অন্যের সম্পদের প্রহরাদার হিসেবে ভূমিকা পালন করে। মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য সে করে না, যদি পার্থক্য করেও তাহলে পার্থক্য করবে শুধুমাত্র আল্লাহভীতির ভিত্তিতে। কারণ যে ইসলামী আদর্শ সে গ্রহণ করেছে, সেই আদর্শই তাকে শিখিয়েছে, ঐ ব্যক্তিই সবথেকে বেশী সম্মান-মর্যাদার অধিকারী, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালাকে সর্বাধিক ভয় করে।

ইসলামী বিপ্লব এমনই এক বিপ্লব যে– যার ভিত্তি রচিত হয়েছে মানুষের মর্যাদার ওপর আর তা এমন মর্যাদা যাকে দুনিয়ার সব কিছুর বিনিময়েও বিসর্জন দেয়া যায় না। এই বিপ্লবের ভিত্তি ন্যায়-নীতির ওপর স্থাপিত, আর তা এমন ন্যায়–নীতি যা কারো স্বৈরাচারী নীতিকে বরদাশত করতে পারে না– পারে না কারো ওপর কোনো নির্যাতন সহ্য করতে। এ বিপ্লবী পয়গাম মানুষের মন-মানসিকতায় ও চিন্তার জগতে

প্রবেশ করার সাথে সাথেই তাকে কার্যত প্রয়োগ করার জন্য সে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠে। মহান আল্লাহর অবতীর্ণ করা এ মতবাদ অনুযায়ী একটি নতুন বিশ্ব প্রতিষ্ঠার আগে সে কিছুতেই শান্ত হতে পারে না এবং নিজের তৎপরতা থেকে নীরব-নিস্তব্ধ ও বিরত হতে না। ইসলাম একটা বিপ্লবী মতবাদ একথার তাৎপর্য এখানেই। অতএব যারা প্রকৃত অর্থে আল্লাহর ওপর সত্যিকারের ঈমান রাখে একমাত্র তারাই আল্লাহর পথে জিহাদের হক আদায় করতে পারে । তারাই আল্লাহর কলেমাকে বুলন্দ করার জন্যে প্রাণপনে লড়তে পারে।

চারদিকে জুলুম-নির্যাতনের জয়-জয়কার দেখেও হাত-পা সঞ্চালনের শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয়েও যারা হাত-পা গুটিয়ে রেখেছে- জুলুমের বিরুদ্ধে 'টু' শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করে না, প্রকৃতপক্ষে তাদের মুখে দাড়ি, গায়ে লম্বা জামা আর মাথায় পাগড়ী দেখা গেলেও এদের মন-মানসিকতা ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এদের অন্তরে ইসলামের মূল ভিত্তিসহ প্রবেশ করতে পারেনি। কারণ এদের অন্তরে যদি ইসলাম প্রবেশ করতো তাহলে ইসলামের বিদ্যুৎ স্পর্শে এরা এক একজন বিপ্লবী মুজাহিদে পরিণত হত। হক ও বাতিলের সংগ্রামে শাহাদাতের অদম্য আগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়তো।

সঙ্কীর্ণ জাতিয়তাবাদ তথা জাতি পুজার মোহ যদি আমাদেরকে জালিম এবং সাম্রাজ্যবাদের সাথে লড়তে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, সমাজতন্ত্রের ফানুস যদি আমাদের জায়গীরদারী এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে লড়তে বাধ্য করতে পারে, ব্যক্তি স্বাধীনতার চেতনা যদি আমাদেরকে জালিম-নিষ্ঠুর শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করতে পারে, তাহলে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোরআনের রাজ কায়েমের জন্য কেনো আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম করবো না!

এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, একনায়কত্ব ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ এ সবকিছুই ইসলামের দৃষ্টিতে বিষ ফোড়ার মতো। এসব বিষ ফোড়া সমাজ, দেশ ও জাতির দেহ থেকে উৎখাত করার আপোষহীন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ইসলাম আমাদের প্রতি জানিয়েছে উদাত্ত আহ্বান। 'শুধু মুসলমান হও; এ শক্তিই তোমাকে সমাজের সকল প্রকার জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর করে তুলবে। কিন্তু যদি তুমি এসবের বিরুদ্ধে লড়াই না করো, তবে তোমার অন্তরকে যাচাই করে দেখ ঈমান সম্পর্কে কোন প্রতারণায় পড়নি তো তুমি! তা না হলে সামাজিক জুলুমের বিরুদ্ধে লড়তে ভয় কিসের?

মানবরচিত জীবন ব্যবস্থার অনুসারীরা অগ্রসর হয় আপন শক্তির ওপর নির্ভর করে; কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা অগ্রসর হয় মহাশক্তিধর আল্লাহ তা'য়ালার ওপর

ভরসা করে এবং শাহাদাত লাভের অদম্য আকাংখা বুকে নিয়ে। তাই আল্লাহ্পাক কোরআনে কারীমে বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ-يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ-وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা মুমীনের কাছ থেকে তাদের হৃদয়-মন এবং তাদের ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে মারে এবং মরে। তাদের প্রতি জান্নাত দানের যথার্থ ওয়াদা করা হয়েছে। (সূরা তওবা-১১১)

## আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ-وَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ-يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ، فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوْا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ -وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِىْ رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ - تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ -وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ-

তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে; ভাল ও সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই সর্থকতা লাভ করবে । তোমরা যেন সেসব লোকদের মত না হও যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে। যারা এরূপ আচরণ অবলম্বন করেছে তারা সেদিন কঠোর শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে। যেদিন কিছু লোকের চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কিছু লোকের চেহারা কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হবে তাদেরকে বলা হবে যে, ঈমানের নেয়ামত পাওয়ার পরও কি কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে?

তাহলে এখন এই কুফরী ও আল্লাহর অকৃতজ্ঞতার পরিবর্তে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে তারা খোদার রহমতের আশ্রয়ে স্থান লাভ করবে এবং তারা চিরদিন এই অবস্থায় থাকবে । এটা আল্লাহর বাণী যা যথাযথভাবে আমি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি, কেননা আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের উপর কোন জুলুম করার ইচ্ছাই রাখেন না। যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিষের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ এবং যাবতীয় ব্যাপার ও বিষয় তাঁর দরবারেই পেশ হয়ে থাকে। (সূরা আলে-ইমরান)

এই পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দু'টো উপায় অবলম্বন করা একান্তই জরুরী। প্রথমতঃ যা কল্যাণকর এবং সত্য তা প্রচার করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ যা অকল্যাণকর এবং পাপ তা নির্মূল করতে হবে। এ দু'টো কাজের জন্যেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'উম্মতে মুসলেমা'কে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

তোমরা দুনিয়ার সর্বোত্তম দল, যাদেরকে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখ। (আল কোরআন)

সুতরাং আল্লাহর যমীনে সে ধরনের একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে, এবং সে দলের কাছে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য জ্ঞান ও কৌশলাদি জানা থাকতে হবে। এ ধরনের দলের বর্তমান থাকার একান্ত আবশ্যকতা সম্পর্কে কোরআনের আয়াতের মধ্যেই তাকীদ রয়েছে। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য ও কর্তব্য হবে পৃথিবীতে মানুষের জীবনের ওপর আল্লাহর শরীয়ত কায়েম করা। এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, আল্লাহর শরীয়তের বশ্যতা স্বকার করার পরে মানুষের অবধারিত কর্তব্য হয়ে পড়ে যে, হকের প্রতি আহ্বানকারী দল অন্যান্য মানুষকে হকের প্রতি দাওয়াত দেবে, যেনো দুনিয়ার মানুষ হকের মূল সত্যকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে দেখতে পায়। সাথে সাথে এটাও যেন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারের মধ্যেই কঠোর সত্যকে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার কঠিনতম সংগ্রামী শক্তি নিহিত রয়েছে।

সুতরাং আল্লাহর দেয়া এ জীবনাদর্শ দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করার উপায় হিসেবে ইসলামের প্রচার, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উপদেশ প্রদানের চেয়েও বাস্তব প্রয়োগ ভিত্তিক দৃষ্টান্ত পেশের চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন অনেক বেশী। অতএব একথা সহজবোধ্য যে, আল্লাহর বাণী সরল হলেও তা প্রয়োগ মোটেই সহজ নয়। এ সত্যটা তখনই বুঝতে

পারা যায় যখন আল্লাহর বাণীকে আমরা বাস্তব জীবনে পরীক্ষা করি এবং মানুষের ইচ্ছা, বাসনা, কামনা, রুচি, লোভ, জিদ ও সংস্কার ইত্যাদির সাথে যখনই আল্লাহর বাণীর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তাই উম্মতে মুহাম্মাদী কখনো সফলতা অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষন পর্যন্ত ইসলামী আদর্শ বাস্তবভাবে যমীনে প্রতিষ্ঠিত না হবে।

সত্যকে– সত্য হিসেবে এবং বাতিলকে– বাতিল হিসেবে যদি সঠিক স্বীকৃতি না পায় তাহলে শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীই নয় বরং সমগ্র মানবতা বিপর্যস্ত হবে। সুতরাং সমাজ জীবনে সত্যকে– সত্য বলে এবং বাতিলকে– বাতিল বলে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য একটি সংঘবদ্ধ দলকে বন্ধুর, কন্টকাকীর্ণ, দুর্গম পথ পরিক্রমার দৃঢ় শপথ গ্রহণ করে এগিয়ে আসতে হবে।

## আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

যে আত্মা খেলাফতে ইলাহীর আমানত বহন এবং এর ভারোত্তলন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, ইসলাম মানুষের মধ্যে এমন আত্মাই সৃষ্টি করে থাকে। অপরিহার্য রূপে এ আত্মা এত কঠোর ও লৌহ কঠিন দৃঢ় মজবুত ও নিরঙ্কুশ এবং খালেস হবে যেন এপথে নিজের সমুদয় বস্তু জলাঞ্জলি দিতে পারে, প্রত্যেকটি পরীক্ষাকে স্বাগত জানাতে সক্ষম হয় এবং পার্থিব ধন-সম্পদের মধ্যে কোন বস্তুর দিকে দৃষ্টি না রাখার পরিবর্তে শুধু আখিরাতকেই লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে নেয় ও আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রার্থী থাকে। এ আত্মা এমন নজীরবিহীন আত্মা হবে যেন এ পার্থিব জগতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা অবধি দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, লাঞ্ছনা, ভাগ্য বিড়ম্বনা মন-প্রাণ উজাড় করে দেয়া এমনকি প্রাণ বিসর্জন দেয়ার ন্যায় ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্যে অতিবাহিত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

এসব প্রতিকূলতা ও জটিলতার মোকাবিলার জন্য যে শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন তা. অর্জনের উপায় হচ্ছে 'সবর' বা অসীম ধৈর্য্য অবলম্বন। এ 'সবর' বা ধৈর্য্য মুমিনকে প্রচুর শক্তি দান করে। এর মধ্যে সেই পরিচয় পাওয়া যায় ঈমানের দাবীতে কে কতটা সত্যবাদী। ধৈর্য্য এমন একটি কষ্টি পাথর যার মাধ্যমে মুমিনের সঠিক পরীক্ষা হয়ে যায় এবং প্রমাণ হয়ে যায় সত্য ও মিথ্যার, দুর্বল ঈমানদার ও কপট ব্যক্তিরাও এভাবে ছাঁটাই হয়ে যায়, এরপর ময়দানে যারা টিকে থাকে তারা সেসব মর্দে মুজাহিদ, প্রকৃতপক্ষে যারা দশগুণ শক্তিধর শত্রুর মোকাবিলায় বিজয় লাভে সক্ষম।

দেশে দেশে, যুগে যুগে শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন সেসব মর্দে মুজাহিদরা। সহ্য করেছেন জালিম শক্তির অত্যাচার ও লাঞ্ছনা-নিগ্রহ। তাঁদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে জেলখানার অমানুষিক জীবন। ফাঁসীর মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে তাঁদের

চোখের সামনে, মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে ইসলামী আদর্শের সেসব বীর সৈনিককে 'সুখে-শান্তিতে আবার জীবনে বেঁচে থাকতে পার, যদি ত্যাগ কর আদর্শের ঐসব পাগলামীকে। প্রতি ক্ষেত্রে প্রতি কণ্ঠ থেকে নির্ভীক উত্তর এসেছে– 'ইসলামের জন্য জীবন, ইসলামের জন্য মরণ, ইসলামের জন্য আমাদের বন্ধুর পথ পরিক্রমা, ইসলামী আদর্শ পরিত্যাগ করে জীবনধারণ। এতো অলীক কল্পনা! আমরা চাই মানুষকে ফিরিয়ে দাও সেই ইসলামী রাষ্ট্র, ফিরিয়ে দাও মদীনার সেই ইসলামকে।' জীবন তাঁরা বিলিয়ে দিয়েছেন। সমুন্নত রেখেছেন ইসলাম আদর্শের পতাকা।

## নির্যাতনের শিকার হযরত বেলাল (রাঃ)

হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হাবশ দেশীয় একজন প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও মদীনার মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন ছিলেন। তিনি ছিলেন ক্রীতদাস। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর মুনিব উমাইয়া বিন খালফ তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করতে লাগলো। ইসলামের মহাশত্রু উমাইয়া নিজের ভৃত্য হযরত বেলালকে তাওহীদের বিশ্বাস থেকে ফিরানোর জন্য অমানুষিক ও নির্মম অত্যাচারের ব্যবস্থা করেছিল। দ্বিপ্রহরের খরতাপে অগ্নিস্নাত তপ্ত বালুকার ওপর সে হযরত বেলালকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখত। যাতে করে তিনি একটুও নড়াচড়া করতে না পারেন। ওপরে প্রচন্ড সূর্যোত্তাপ নিচে আগুনের মত বালু– এই ধরনের নিষ্ঠুর অত্যাচারের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হয় তিনি মরে যাবেন নতুবা অসহ্য হয়ে ইসলাম ত্যাগ করবেন। কিন্তু দেখা গেল ওষ্ঠাগত প্রাণ মর্দে-মুজাহিদ তখনও আল্লাহকে ভুলেননি' মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলে উঠতেন 'আহাদ' 'আহাদ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই।

তাঁকে ধারাবাহিকভাবে অত্যাচার করা হতো, কখনও আবু জাহেল, কখনও উমাইয়া, কখনও ইসলামের অন্য দুশমনরা এসে তাঁকে দৈহিক নির্যাতন করতো, রাতেও তাঁর শান্তি ছিল না, যখন তাঁকে বেত মারা হতো, ফলে পূর্ব দিনের জখমগুলো রক্তাক্ত হয়ে উঠত, পুনরায় তাঁকে যখন আবার উত্তপ্ত বালুকার ওপর শুইয়ে দেয়া হত তখন তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চর্বি গলে পড়তো। মাঝে মাঝে তাঁকে মক্কার দুষ্ট তরুণ দলের হাতে ন্যাস্ত করা হতো-তারা তাঁর গলায় রশি বেঁধে মক্কার রাজপথে সারা দিন টেনে-হেচ্‌ড়ে বেড়াত। আবার সন্ধ্যায় তাঁকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফিরিয়ে আনতো, কিন্তু এত নিগ্রহের পরেও তিনি তাওহীদের বিশ্বাস থেকে বিন্দু পরিমাণ সরে আসেননি।

নির্যাতনের ধারাবাহিকতায় একদিন হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়ে মুক্ত করে দেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করলেন। আল্লাহর রাসূলের ইন্তেকালের পর হযরত বেলালকে সফরের সরঞ্জামসহ কোথাও রওয়ানা হতে দেখে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জিজ্ঞেস করলেন, মনে হচ্ছে তুমি যেনো কোথাও চলে যাচ্ছো?

হযরত বেলাল বললেন, 'উমর, যে মদীনায় রাসূল নেই, সেখানে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। রাসূল শূন্য মদীনা আমার কাছে অসহনীয়। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কোনো দূর দেশে গিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত থেকে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো পার করে দেবো।'

হযরত বেলার দামেশকে চলে গেলেন। দীর্ঘদিন পরে এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, যে রাসূলের বিচ্ছেদ বেদনায় তিনি মদীনা ত্যাগ করেছেন, সেই রাসূল স্বপ্নে তাঁকে বলছেন, হে বেলাল! তুমি আমার কাছে আর আসো না কেনো?'

হযরত বেলালের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। রাসূলের বিচ্ছেদ বেদনা তাঁর মধ্যে পুনরায় নতুন করে জেগে উঠলো। মদীনায় গেলে জীবিত রাসূলকে তো দেখা যাবে না, কিন্তু আল্লাহর রাসূল যে পথে হেঁটেছেন, সেই এবং সেই পথের ধূলি তো দেখা যাবে– যে ধূলিতে মিশে রয়েছে আল্লাহর রাসূলের পবিত্র পদের স্পর্শ মোবারক। মদীনায় যাবার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন এবং দ্রুত বেগে তিনি মদীনার দিকে ছুটলেন।

মদীনায় বেলাল এসেছে– এ সংবাদ সকলেই জেনে গেলো। রাসূলের মুয়াজ্জিন এখন মদীনায়, লোকজন দলে দলে এসে তাঁকে অনুরোধ করলো, বেলাল! আল্লাহর রাসূল জীবিত থাকতে তুমি আযান দিয়েছো, আমরা আযান শোনামাত্র মসজিদে ছুটে এসে আল্লাহর নবীর পেছনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছি। তুমি আজ আবার আযান দাও। আমাদের কাছে মনে হবে, আল্লাহর রাসূল এখনো জীবিত আছেন! মসজিদে গেলে আবার আমরা রাসূলের পেছনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়াতে পারবো। দেখতে পাবো রাসূলের পবিত্র চেহারা মোবারক।

হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রাজী হলেন না, তিনি বললেন, 'মদীনাবাসীরা তোমরা শোন, আমি যখন মসজিদে নববীর মিনারে উঠে আযানের মধ্যে বলতাম 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' তখনি আমার নজর পড়তো মিম্বরের ওপর উপবিষ্ট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের প্রতি। কিন্তু আজকে আযান দিতে গিয়ে যখন আমার দৃষ্টি পড়বে মসজিদে নববীর মিম্বারের দিকে, তখন দেখবো মিম্বার শূন্য– সেখানে রাসূল নেই।

এই দৃশ্য তো আমি সহ্য করতে পারবো না।' অবশেষে আল্লাহর রাসূলের কলিজার টুকরা হযরত ইমাম হাসান-হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমের অনুরোধ হযরত বেলাল উপেক্ষা করতে পারলেন না, তিনি মসজিদের মিনারে উঠে আযান দিতে লাগলেন। দীর্ঘদিন পর বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর আযানের সুমধুর ধ্বনি মদীনাবাসীদের পাগল করে তুললো। রাসূল হারানোর শোকে মদীনায় মাতম উঠলো। মদীনায় উঠলো কান্নার রোল।

হযরত বেলাল 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' উচ্চারণ করছেন আর স্বভাব মতোই মিম্বরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তিনি দেখলেন, সেখানে প্রিয় রাসূল নেই। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে গেলেন। এরপর কিছুদিন তিনি মদীনায় অবস্থানের পর আবার মদীনা হতে চলে গেলেন। হিজরী বিশ সনের কাছাকাছি তিনি দামেশক নগরে ইন্তেকাল করেন।

## অগ্নি পরীক্ষায় হযরত খাব্বাব (রাঃ)

যাঁরা দ্বীন ইসলামের জন্য নিজেদেরকে কোরবানী এবং আল্লাহর রাস্তায় কঠিনতম শাস্তি ভোগ করেছিলেন, হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রাথমিক স্তরের পাঁচ ছয় জনের ইসলাম গ্রহনের পর তিনি মুসলমান হন। সুতরাং তাঁকে যে কি ধরনের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল তা সহজই অনুমেয়। তাঁর জীবনের পরিবর্তন অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক। তাঁর প্রতি কাফেরদের অত্যাচারের অবধি ছিল না। লৌহ জেরা পরিয়ে তাঁকে আরবের মরুভূমির প্রচন্ড রোদে শায়িত করে রাখা হতো। রোদের তাপে তাঁর শরীর থেকে বিগলিত ধারায় ঘর্ম নির্গত হতো। অধিকাংশ সময়ই তাঁকে উত্তপ্ত বালুকাতে শয়ন করে রাখা হতো। উত্তাপে তাঁর কোমরের গোশত পর্যন্ত গলে যেত।

তিনি জনৈকা স্ত্রী লোকের গোলাম ছিলেন। সেই স্ত্রী লোকটির নিকট যখন সংবাদ পৌঁছল যে, খাব্বাব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হয়েছেন। তখন থেকে স্ত্রী লোকটি লোহার শলাকা গরম করে তাঁর মাথায় দাগ দিতে লাগল। এরপরেও হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কোনক্রমেই বিচলিত হচ্ছেন না দেখে একদিন কোরাইশ দলপতিগণ মাটিতে প্রজ্বলিত অংগার বিছিয়ে তার ওপর তাঁকে চিৎ করে শায়িত করতো এবং কতিপয় পাষণ্ড তার বুকে পা দিয়ে চেপে ধরতো। অংগারগুলো তার পিঠের গোস্তা-চর্বি পুড়াতে পুড়াতে এক সময় নিভে যেত, তবুও নরাধমরা তাঁকে ছাড়ত না। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পৃষ্ঠের চামড়া এমনভাবে পুড়ে গিয়েছিল যে, শেষ বয়স পর্যন্ত তার সমস্ত পৃষ্ঠে ধবল কুষ্ঠের ন্যায় ঐ দাগের চিহ্ন বিদ্যামান ছিল। তিনি কর্মকার ছিলেন। তিনি জেরা,

তরবারী ইত্যাদি প্রস্তুত করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর লোকের নিকট তার যে সকল প্রাপ্য ছিল, কোরাইশদের নির্দেশমতে তা কেউই আর দেয়নি। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর খেলাফতের সময় তিনি হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে তাঁর প্রতি ইসলাম বিরোধিদের নির্যাতন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁর পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর কোমর দেখে বললেন, এমন কোমর তো আর আমি কারো দেখিনি। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আমাকে আগুনের অঙ্গারে চেপে রাখা হতো। তাতে আমার রক্ত এবং চর্বি গলে আগুন নিভে যেত।'

মহান আল্লাহর রহমতে সাহাবায়ে কেরাম ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীম ত্যাগ ও কোরবানীর বিনিময়ে ইসলাম বিজয়ী হবার পরে ইসলামী সাম্রাজ্যে প্রাচূর্যতা দেখা দিয়েছিলো। প্রায় সাহাবায়ে কেরামই স্বচ্ছলতা লাভ করেন। হযরত খাব্বাব যখন রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন, তখন কেউ কেউ তাঁকে বলেছিলেন, আপনি খুশী হন যে, ইন্তেকালের পরে আপনি আপনার সাথীদের সাথে হাউজে কাওসারের পাশে সাক্ষাৎ করবেন।

এ কথা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন আর বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। তোমরা সেসব সাথীর কথা বলছো, যারা পৃথিবীতে কোনো প্রতিদান পায়নি। আখিরাতে তাঁরা অবশ্যই নিজেদের কর্মের প্রতিদান পাবে। কিন্তু আমরা পরে রয়েছি এবং দুনিয়ার নিয়ামতের অংশ এত পেয়েছি যে, ভয় হয় তা আমাদের আমলের সওয়াব হিসেবেই হিসেব না হয়ে যায়।

ইন্তেকালের কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁর সামনে কাফন আনা হলো, তিনি কাফন দেখে অতীতে মুসলমানদের দুরাবস্থার কথা স্মরণ করে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন– এতো সম্পূর্ণ কাফন! আফসোস! হামযাকে (রাঃ) একটি ছোট ধরনের কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিলো। যেটি তাঁর সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করার মতো ছিলো না। তাঁর পা আবৃত করলে মাথা বের হয়ে যেতো আর মাথা আবৃত করলে পা বের হয়ে যেতো। পরিশেষে আমরা তাঁর পা ইযখির নামক ঘাস দিয়ে ঢেকে কাফনের কাজ সম্পন্ন করেছি।

৩৭ হিজরীতে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইন্তেকাল করেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তাঁকেই সর্বপ্রথম কুফায় দাফন করা হয়। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর চোখে কুফা শহরের বাইরে সাতটি কবর পড়লো। তিনি সাথীদের কাছে জানতে চাইলেন, এসব কোন লোকজনের কবর! এখানে তো কোনো কবর ছিলো না!

তাঁকে বলা হলো, এই প্রথম কবরটি খাব্বাব বিন আরাত্তের। তাঁর ওসিয়ত অনুযায়ী সর্বপ্রথম তাঁকে এখানে দাফন করা হয়। অবশিষ্ট কবরগুলো অন্যদের। তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা তাঁদেরকে এখানে দাফন করেছে।

এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর চোখ দুটো অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। তিনি তাঁর কবরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলতে লাগলেন, খাব্বাবের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তিনি স্বেচ্ছায় ও আনন্দ চিত্তে আল্লাহর দ্বীন কবুল করেছিলেন এবং নিজের ইচ্ছাতেই হিজরত করেছিলেন। সারাটি জীবন তিনি জিহাদে কাটিয়েছেন এবং ইসলামের জন্য অকল্পনীয় বিপদ সহ্য করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা সৎলোকদের আমল নষ্ট করেন না।

হযরত খাব্বাব ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ইতিহাসের পাতায় নিজের দৃঢ় সংকল্প ও অবিচল-অটলতার এমন তুলনাহীন চিহ্ন এঁকেছেন যে, প্রত্যেক যুগের ঈমানদারদের জন্য তা চেতনার মশাল হয়ে রয়েছে। তিনি নিজের বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে জেনে বুঝে মুসলমান হন এবং হিজরত করেন। সারাটি জীবন জিহাদে অতিবাহিত করেন এবং যে কোনো ধরনের দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করেন। যে ব্যক্তি কিয়ামতের কথা স্মরণে রাখে আখিরাতের জীবনে হিসাব দিতে হবে– এ কথা বিশ্বাস করে, তাঁর পক্ষে এই পৃথিবীতে ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য হালাল পথে ছোট কাজ করা কোনোক্রমেই লজ্জার নয়। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কর্মকারের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

## হযরত আম্মার (রাঃ)-এর প্রতি নিষ্ঠুরতা

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও তার মাতা-পিতা ইসলাম গ্রহন করার পর ইসলামের দুশমনরা তাঁদের ওপরে লোমহর্ষক নির্যাতন করতে থাকে। আরবের মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর ওপরে তাঁদেরকে শাস্তি দেয়া হতো। আঘাতের পর আঘাত করতো পাষন্ডের দল। আঘাত সহ্য করতে না পেরে তিনি অনেক সময় জ্ঞানহারা হয়ে যেতেন। তাঁর পাশ দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাবার সময় তাঁকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ ও জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন।

তাঁর পিতা হযরত ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে ইসলামের দুশমনরা ধরে দুই পায়ে দুটো রশি বেঁধে তা দুটো উটের পায়ে বেঁধে দেয়া হলো। এরপর উট দুটিকে দুই দিকে যাবার জন্য আঘাত করা হলো। উট দুটো দুই দিকে দৌড় দেয়ার পরে হযরত ইয়াসিরের দেহ ছিঁড়ে দুই ভাগ হয়ে গেলো এবং তিনি তৎক্ষণাত শাহাদাতবরণ করলেন।

হযরত আম্মারকেও প্রহার করতে করতে অচেতন করে ফেলা হতো। তাঁর গর্ভধারিণী মা হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা দেখতেন– কিভাবে তাঁর কলিজার টুকরা সন্তানকে প্রহার করা হচ্ছে। সন্তান প্রহৃত হচ্ছে আর তিনি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তাঁর মুখে কালেমার ঘোষণা শুনে নরপশু আবু জেহেল ক্রুদ্ধ হয়ে হযরত সুমাইয়াকে বর্শা বিদ্ধ করে হত্যা করলো। নারীদের মধ্যে হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাই সর্বপ্রথম শাহাদাতবরণ করেন।

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ– মসজিদে কুবা নির্মাণে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সাথে ভূমিকা রাখেন। ইমাম হাকিম (রাহঃ) তাঁর মুসতাদরাক-এ উল্লেখ করেছেন যে, কুবা মসজিদ নির্মাণের জন্য হযরত আম্মারই পাথর একত্রিত করেছিলেন এবং মসজিদের নির্মাণ কাজও তিনিই আঞ্জাম দিয়েছিলেন। মদীনার মসজিদে নববী নির্মাণেও তিনি বিরাট ভূমিকা রাখেন।

তিনি যখন শাহাদাতবরণ করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৯০ বছরের অধিক। কেউ বলেছেন ৯৪ বছর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শাহাদাতের ব্যাপারে ভবিষ্যৎ বাণী করে বলেছিলেন, তোমার জীবনের সবশেষ চুমুক তুমি যা পান করবে তা হবে দুধ।

বয়স বেশীর কারণে মহাসত্যের জন্য লড়াই করতে গিয়ে যুদ্ধের ময়দানে তাঁকে কেউ-ই দুর্বল দেখেনি। তিনি অসীম সাহকিতার ও বলিষ্ঠতার সাথে যুবক যোদ্ধার ন্যায় ময়দানে ভূমিকা পালন করেছেন। সেদিন যুদ্ধের ময়দানে প্রচন্ড যুদ্ধ হচ্ছিলো। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশের শেষ প্রান্তে পৌছে গিয়েছে। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রবল পিপাসা অনুভব করলেন। সম্মুখে পেলেন দুধ, তাই তিনি পান করলেন। এরপর তাঁর মনে পড়লো আল্লাহর রাসূলের ভবিষ্যৎ বাণীর কথা।

তিনি অনুভব করলেন, আজই তাঁর জীবনের শেষ দিন এবং এখুনি তিনি শাহাদাতাবরণ করবেন। তিনি নিজের মুখেই তাঁর সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলের বলা কথা বললেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, হে আম্মার! সবশেষে তুমি যা পান করবে তা হবে দুধ।

এ কথা বলতে বলতে তিনি শত্রু বাহিনীর দিকে প্রচন্ড বেগে ধাবিত হলেন। সম্মুখে হযরত হাশিম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে যুদ্ধের পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, হে হাশিম! সম্মুখে অগ্রসর হও! জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে এবং মৃত্যু নেজার (এক ধরনের অস্ত্র) কিনারায় অবস্থান করে। জান্নাতের দরজা খোলা হয়েছে এবং সেখানের হুররা সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা

করছে। আজ আমি বন্ধুদের সাথে মিলিত হবো। আজ আমি আমার বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর দলের সাথে মিলিত হবো। এ কথা বলতে বলতে তিনি শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি যেদিকেই যেতেন, সেদিকের শত্রুসৈন্যের রণবুহ্য ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো। যুদ্ধের ময়দানে তিনি এক সময় শাহাদাতের শরাবান তহুরা পান করে এই পৃথিবী ত্যাগ করলেন।

## হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ)

হযরত আবুযর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। আলেম এবং দরবেশ হিসাবেও তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আবুযর এমন গভীর বিদ্যা অর্জন করেছিলেন যে, যা অনেক লোকই আয়ত্ব করতে অক্ষম। তিনি তাঁর গভীর পান্ডিত্য কখনও কারো কাছে প্রদর্শন করতেন না, তিনি নিজের জ্ঞানের আলো বিনয় এবং নম্রতার আবরণ দিয়ে সর্বদাই ঢেকে রাখতেন।

তাঁর কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির সংবাদ পৌঁছলে তিনি তার ভাইকে মক্কায় পাঠালেন। যিনি নুবুয়াতের দাবী করছেন, যার কাছে ওহি আসে এবং যিনি আসমানের খবর পান, তিনি কেমন লোক, তার চরিত্র কেমন, তিনি কি কি কথা বলেন। তাঁর আচার ব্যবহার কেমন, তা জানার জন্য তাঁর ভাইকে পাঠিয়ে দিলেন।

তাঁর ভাই মক্কা থেকে ফিরে গিয়ে হযরত আবুযরকে বললেন, 'আমি লোকটিকে সৎকথা বলতে, সদাচার করতে এবং পবিত্রতা অর্জন করতে মানুষকে আদেশ দিতে শুনেছি। আমি তাঁর এমন একটি কথা শুনেছি যা কোন ভবিষ্যদ্বাণীও নয় বা কোন কবির বাক্যও নয়।'

ভাইয়ের কথায় হযরত আবুযরের মন শান্ত হল না। নিজে সব কিছু জানার জন্য তিনি মক্কা রওয়ানা হলেন এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে সোজা কা'বা গৃহে প্রবেশ করলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পারলেন না, অন্য কাউকে জিজ্ঞাস করাও সমীচীন মনে করলেন না।

সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি ঐ অবস্থায়ই থাকলেন। সন্ধ্যার পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দেখলেন যে, একজন বিদেশী মুসাফির মসজিদে অবস্থান করছেন। মুসাফিরদের তত্ত্বাবধান করার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল, কাজেই তিনি হযরত আবুযরকে ডেকে এনে নিজের বাড়ীতে খাওয়ালেন এবং রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

তিনি খাওয়া দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়লেন নিজের পরিচয় এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্য প্রকাশ করলেন না। সকালে উঠে তিনি আবার মসজিদে চলে গেলেন এবং সমস্ত দিন সেখানে রইলেন। সেদিনও তিনি আল্লাহর নবীকে নিজেও চিনতে পারলেন না বা কারো কাছে জিজ্ঞেসও করলেন না। সন্ধ্যার পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁকে আবার নিজের বাড়ীতে নিয়ে যথারীতি অতিথি সৎকার করলেন; মুসাফির আজও নিজের পরিচয় গোপন রাখলেন এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন না।

ভোরে উঠে হযরত আবুযর পুনরায় মসজিদে চলে গেলেন, আজও তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পারলেন না এবং সেদিনও কাউকে জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলেন না। আল্লাহর নবীর সাথে মেলামেশা করা বা তাঁর সান্নিধ্য বা সাহচর্য তালাশ করা সে সময় বিপজ্জনক ছিল, কারণ তাঁর সম্পর্কে জেনে কেউ যদি ইসলাম কবুল করে, সে জন্য কাফিররা মক্কায় নতুন আগন্তুকসহ সকলের প্রতি সর্তক দৃষ্টি রাখতো। ইসলামের প্রতি বা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কারও বিন্দুমাত্র অনুরাগ প্রকাশ পেলেই তার আর নিস্তার ছিল না; ইসলাম বিরোধিদের অত্যাচার ও নির্যাতনে ইসলামের প্রতি অনুরাগী লোকটিকে একেবারে জর্জরিত করে ফেলতো। হযরত আবুযর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ কারণেই নিজের পরিচয় গোপন করেছিলেন।

তৃতীয় দিনেও তাই ঘটলো, কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মুসাফিরকে আহারাদি করিয়ে শোবার পূর্বে তাঁকে মক্কায় আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলেন। হযরত আবুযর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে প্রথমে সঠিক সংবাদ বলার জন্য শপথ করিয়ে তারপর নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তার কথা শুনে বললেন, 'তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। কাল সকালে আমি যখন মসজিদে রওয়ানা হবো তখন আপনিও আমাকে অনুসরণ করবেন। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে যে আপনি আমার সঙ্গী। রাস্তায় যদি কোন শত্রু সামনে পড়ে, তাহলে আমি কোনো কারণ দেখিয়ে বা জুতার ফিতা বাঁধতে বসে পড়ব, আপনি তখন আমার জন্য অপেক্ষা না করে সোজা চলতে থাকবেন এবং এমনি করে বুঝিয়ে দিবেন যে আমি আপনার সঙ্গী নই বা আপনার ও আমার উদ্দেশ্য এক নয়।'

ভোরে উঠে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মসজিদের দিকে যাত্রা করলেন, হযরত আবুযর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও তাঁর পিছে পিছে যেতে

লাগলেন। যথাসময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর কথাবার্তা মনযোগ দিয়ে শুনলেন। সত্যান্বেষী প্রাণ সত্যের আহ্বান শুনে কখনও স্থির থাকতে পারে না। হযরত আবুযর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পিপার্সিত প্রাণও সত্যের পিযুষধারা পান করে এক মুহূর্তও স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি সেখানে বসেই ইসলাম গ্রহণ করে অমর জীবন লাভ করলেন।

অত্যাচার ও নির্যাতনের আশঙ্কা করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবুযর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বললেন, 'তুমি ইসলাম গ্রহণের কথা এখন গোপন করে রেখো এবং নিরবে বাড়ী চলে যাও। মুসলমানদের আরও একটু প্রতিপত্তি এবং শক্তি সামর্থ হলেই চলে এসো।'

হযরত আবুযর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আমি সেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি তাওহীদের মহাবাণী কাফিরদের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবো।'

এ কথা বলেই তিনি তৎক্ষণাৎ কা'বা গৃহে প্রবেশ করে উচ্চস্বরে তাওহীদের কালেমা পাঠ করলেন। আর যায় কোথায়! চারদিক থেকে কাফিররা ভিমরুলের মত উড়ে এসে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আঘাতে আঘাতে হযরত আবুযর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল। নিষ্ঠুর-নির্মম আঘাতে তিনি মুমূর্ষ হয়ে পড়লেন। ঐ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস, যদিও তিনি তখন পর্যন্ত মুসলমান হননি তবুও মুমূর্ষু হযরত আবুযরকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেলেন এবং আঘাতকারী লোকদের বললেন, কি সর্বনাশ! এ যে গিফারী গোত্রের লোক, শাম দেশের রাস্তাতেই যে তাদের বাসস্থান, এর মৃত্যু হলে যে ঐ দেশের সাথে তোমাদের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যই বন্ধ হয়ে যাবে। একে মেরে ফেললে তোমাদের সেখানে যাওয়ার আর কি কোন পথ থাকবে?

তাঁর কথায় ইসলামের দুশমনরা কিছুটা যেনো চমকে উঠলো এবং সেদিনের মতো তারা হযরত আবুযরের ওপর অত্যাচার বন্ধ করলো। পরের দিনও হযরত আবুযর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কা'বা শরীফে প্রবেশ করে ঠিক পূর্বের ন্যায়ই কালেমা শাহাদাৎ পাঠ করলেন, সে দিনও কাফিররা তাঁকে চরম আঘাত করে মরণাপন্ন করে তুললো। এবারেও হযরত আব্বাস ইসলামের দুশমনদেরকে বুঝিয়ে হযরত আবুযর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করলেন।

এটাই সত্যিকার ঈমানদারের পরিচয়। ভয় নেই, সঙ্কোচ নেই, আল্লাহর প্রেমিক, আল্লাহর পবিত্র নামের গুণকীর্তন ও পৃথিবীর বুকে তা প্রতিষ্ঠিত করতে, সর্বশ্রেণীর মানুষের সম্মুখে তা প্রচার করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেন না। এ কারণেই হযরত আবুযর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিষেধ সত্ত্বেও দ্বিধাহীন চিত্তে কাফিরদের কেন্দ্রে

দাঁড়িয়ে আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা উচ্চারণ করতে এতটুকুও শঙ্কিত হননি। হযরত আবুযর ইসলাম গ্রহণ করেছেন, এ কথা কাফিররা জানলে তাঁর ওপর নির্যাতন চালাবে, এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিজের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে ঈমানের আগুন এমনভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো এবং ঈমানের যে স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন, তা আর গোপন রাখতে পারেননি। অন্যকেও ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন।

হযরত আবুযর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ফুলশয্যায় শয়ন করে কালাতিপাত করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেননি। ঈমানের যে স্বাদ তিনি লাভ করেছিলেন, সে ঈমানের দিকে অন্যকেও আহ্বান করার জন্যই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করলে এবং সে ঘোষণা কাবা চত্তরে ইসলামের দুশমনদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দিলে কি হতে পারে, তা হযরত আবুযরের অজানা ছিলো না। তিনি কি পারতেন না, তার ইসলাম গ্রহণ করার কথা গোপন রাখতে! ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি তো তাঁর নিজের এলাকায় চলে যেতে পারতেন!

কিন্তু তিনি এসবের কিছুই করেননি। তিনি যখন দেখলেন, আল্লাহর রাসূলের প্রতি এসব লোক কি ধরনের অত্যাচার করছে। আর সেই রাসূলের পবিত্র হাতে হাত রেখেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আল্লাহর নবী যদি নির্যাতন সহ্য করতে পারেন, তাহলে তিনি সেই নবীর অনুসারী হয়ে কেনো নির্যাতন সহ্য করতে পারবেন না!

তিনি যখন কালেমা পাঠ করেছেন, সেই কালেমা তাঁর মধ্যে ঈমানের যে শক্তিদান করেছে, সেই শক্তিতেই তিনি দুশমনদের সম্মুখে মহাসত্যের ঘোষণা দিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

কালেমা শাহাদাৎ এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল, ঐকান্তিকভাবে তা একবার পাঠ করলে মানুষের মনে যে শক্তির বন্যা আসে, তার সম্মুখে জগতের অত্যাচার আর নির্মম নির্যাতন তৃণ-খণ্ডের মত ভেসে যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছিলো ঈমানী শক্তির কারণেই। ঈমানী শক্তির কাছে সংখ্যা গরিষ্ঠ কাফিররা মুষ্টিমেয় সাহাবায়ে কেরামের কাছে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। যে ব্যক্তি নিজের সবকিছু মহান আল্লাহর জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, সেই ব্যক্তি পৃথিবীর কোনো শক্তির সম্মুখে মাথানত করতে পারে না। এই ধরনের মুসলমানদের একটি দলের সম্মুখে দুনিয়ার ইসলাম বিরোধী শক্তি মুহূর্তকালের জন্যও টিকে থাকতে পারে না। আজ মুসলমানদের ঈমানী শক্তি নেই, এ কারণেই তারা দুনিয়া জুড়ে নির্যাতিত হচ্ছে।

## হযরত সোহায়েব (রাঃ)

হযরত সোহায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একত্রে ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি ছিলো এমন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময় হযরত আরকাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা দুইজন পৃথক পৃথক সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন এবং বাড়ীর দরজার সম্মুখে উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। কিছু কথাবার্তার পরে উভয়ে জানতে পারলো যে, তাঁদের দু'জনেরই উদ্দেশ্য এক। দু'জনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।

বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে তারা যথারীতি ইসলাম গ্রহণ করলেন। সে সময় ইসলাম গ্রহণ করার অর্থই ছিলো স্বেচ্ছায় নির্যাতন-নিষ্পেষণ ডেকে আনা। তাঁরাও এর ব্যতীক্রম ছিলেন না, নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরা উভয়ে মক্কা থেকে হিজরত করার সঙ্কল্প করলেন। কিন্তু ইসলামের দুশমনদের এটাও সহ্য হলো না। তাঁরা মক্কার বাইরে স্বাধীনভাবে ইসলাম পালন করবে, এটা কাফিরদের কাছে এক অসহনীয় ব্যাপার। কোনো মুসলমান হিজরত করবে, এ সংবাদ জানতে পারলে কাফিররা নির্যাতানের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিতো।

সুতরাং হযরত সোহায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হিজরত করবেন, এটা জানতে পেরেও কাফেররা তার পিছু লেগে গেল। একদল কাফের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাকে ধরতে গেল। তিনি তখন তুনির হতে তীর বের করে রাখতে লাগলেন এবং বললেন, 'শোন তোমরা জানো যে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তীরন্দায। আমার হাতে একটি তীর থাকা পর্যন্ত তোমরা কেউ-ই আমার কাছে আসতে পারবে না। তীর ফুরিয়ে গেলে তরবারীর সাহায্য নেব এবং যতক্ষণ তরবারী হাতে থাকবে, ততক্ষন কেউই আমার কাছে আসতে পারবে না। তারপর তরবারী কোনক্রমে আমার হাত ছাড়া হয়ে গেলে তোমরা আমাকে যা খুশী করতে পারে। এ কারণে তোমাদের কাছে আমি একটি প্রস্তাব দিচ্ছি, তোমরা যদি আমার প্রাণের পরিবর্তে আমার সম্পদ গ্রহণ করো তাহলে তোমাদেরকে আমার সম্পদের সন্ধান বলে দিতে পারি।

সম্পদ লোভী দুশমনের দল তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলে তিনি বলে দিলেন যে, তাঁর সম্পদ কোথায় রয়েছে। এভাবেই হযরত সোহায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজের সম্পদ দিয়ে নিজেকে কিছুটা হলেও বিপদ মুক্ত করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কো'বাতে অবস্থান করছিলেন, হযরত সোহায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর অবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি বললেন,

'বড় লাভের ব্যবসাই করলে সোহায়েব।' হযরত সোহায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খেজুর খাচ্ছিলেন এবং আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন তা দেখে আমি তার সাথে খেতে বসে পড়লাম। তখন আল্লাহর নবী বললেন, 'চোখের রোগে ভুগছো আবার খেজুরও খাচ্ছো। দেখছ কেমন করে!'

হযরত সোহায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল' যে চোখটি ভালো সেটা দিয়ে দেখে খাচ্ছি। হযরত সোয়াহেবের কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে মধুর হাসি ফুটে উঠলো। হযরত সোহায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খুব অমিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি অধিক খরচ করতেন। একদিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁকে বলেছিলেন, তুমি খুব বেশী অনর্থক খরচ করো।

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমি অন্যায়ভাবে একটি পয়সাও খরচ করি না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শাহাদাতবরণের সময় উপস্থিত হলে তিনি হযরত সোহায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে তার জানাযার আদায়ের জন্য অসিয়াত করে গিয়েছিলেন।

## হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আরকামের বাড়িটা ছিল এই ইসলামী কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। এই বাড়িতেই হযরত ওমর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইসলামের ইতিহাসে সেদিনই সর্বপ্রথম স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উচ্চকণ্ঠে তাকবির দিয়েছিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পিতার নাম ছিল খাত্তাব এবং মাতার নাম ছিল হান্তামা। তাঁরা ছিলেন আ'দী গোত্রের লোক। হযরত ওমরের অষ্টম উর্ধ্ব পুরুষ কা'বা নামক ব্যক্তির মাধ্যমে বিশ্বনবীর নছবের সাথে মিলিত হয়েছে। মক্কার জাবালে আকির নামক পাহাড়ের পাদদেশে ছিল হযরত ওমরের উর্ধ্বতন গোষ্ঠীর বাসস্থান। ইসলামের স্বর্ণালী যুগে সে পাহাড়ের নাম দেয়া হয়েছিল জাবালে ওমর বা ওমরের পাহাড়।

যে সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভ করেন সে সময়ে গোটা কুরাইশদের মধ্যে মাত্র সতেরজন লোক লেখা পড়া জানতেন। তাঁর মধ্যে হযরত ওমর ছিলেন একজন। সে সময়ের ইতিহাস থেকে জানা যায় হযরত ওমর ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ বীর এবং বিখ্যাত কুস্তিগীর, পাহলোয়ান। উকাযের মেলায় তিনি কুস্তি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। সমকালিন বিখ্যাত কবিদের সমস্ত কবিতা ছিল তাঁর মুখস্থ, এ থেকে ধারণা করা যায় তাঁর মধ্যে কাব্য প্রতিভা কি

ধরণের ছিল। আরবী কাব্য সমালোচনার বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতির আবিষ্কারক ছিলেন তিনি। বংশ তালিকা বিদ্যায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। ঐতিহাসিকগণ বলেন তাঁর জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির সুনাম চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কোন গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটলে তাকেই দূত হিসাবে প্রেরণ করা হত। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী এবং সে কারণে তাকে বিদেশ ভ্রমণ করতে হত। ফলে বিদেশের নেতৃবৃন্দ এবং শাসক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশার কারণে তাঁর জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি বিশেষ এক স্তরে উন্নিত হয়েছিল।

নেতৃত্বের যাবতীয় গুণাবলী ছিল তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। সেই মূর্খতার যুগেও তিনি ছিলেন নেতা আবার ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তিনিই ছিলেন নেতা। ইসলামী আন্দোলনের জন্য তাঁর মত ব্যক্তিত্বের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ কারণেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর মত ব্যক্তিত্বের জন্য দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আমর ইবনে হিশামকে ইসলামে দাখিল করে তুমি ইসলামকে শক্তিশালী করো।'

তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা ছিল বড় অপূর্ব। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বংশের আরেকজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁর নাম ছিল হযরত নুয়াইম ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে তেমন কোন সংবাদ রাখতেন না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যে সময় ইসলামের কথা শুনলেন তখন তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়লেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন যারা ইসলাম কবুল করেছিল, তিনি তাদের প্রাণের শত্রু হয়ে পড়লেন। তিনি যখন শুনলেন তাঁর এক দাসীও ইসলাম কবুল করেছে, তখন তিনি সেই দাসীর ওপরে চরম নির্যাতন করলেন। দাসীকে যখন তিনি ইসলাম ত্যাগ করাতে সম্মত হলেন না, তখন তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, ইসলাম যার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে তাকেই তিনি এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিবেন। তারপর শানিত তরবারী কাঁধে ঝুলিয়ে তিনি বিশ্বনবীর সন্ধানে বের হলেন। পথে তাঁর সাথে কথা হয়েছিল হযরত নুয়াইম ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে। সে হযরত ওমরকে জিজ্ঞাসা করলো, 'হে ওমর! তুমি এমন ক্রোধের সাথে কাঁধে তরবারী ঝুলিয়ে কোথায় যাচ্ছো?'

লোকটির প্রশ্নের জবাবে হযরত ওমর ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে একটা শেষ বুঝাপড়া করতে।' লোকটি তাঁকে সাবধান করে দেয়ার জন্য বললো, 'তাঁর কোন ক্ষতি করলে তাঁর গোত্রের লোকজনের হাত থেকে তুমি নিস্তার পাবে কি করে?' লোকটির একথায় হযরত ওমর

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি বোধহয় তাঁর আদর্শ গ্রহণ করেছো?' লোকটি হযরত ওমরের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য দ্রুত কণ্ঠে বললো, 'একটি সংবাদ শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে, তোমার বোন এবং তাঁর স্বামী ইসলাম কবুল করেছে।'

এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত ওমর ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তিনি ছুটলেন তাঁর বোনের বাড়ির দিকে। তাঁর বোন ভগ্নিপতি ঘরের দরোজা বন্ধ করে সে সময় হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে কোরআনের সূরা ত্ব-হা শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। হযরত ওমর বোনের বন্ধ দরজার কাছে যেতেই তাঁর কানে কোরআনের মধুর বানী প্রবেশ করে তাঁর অন্তরের পূঞ্জিভূত বরফ গলানো শুরু করে দিয়েছিল। তিনি গর্জন করে বোনের দরজায় আঘাত করলেন। ওমরের আভাস পেয়ে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আত্মগোপন করলেন। দরজা খুলে দেয়ার পরে হযরত ওমর ঘরে প্রবেশ করে তাদের কাছে ধমকের সুরে জানতে চাইলেন, 'তোমরা কি পড়ছিলে? আমি তাঁর শব্দ পেয়েছি।'

তাঁরা জবাব দিলেন, 'আমরা পরস্পরের মধ্যে কথা বলছিলাম।' হযরত ওমর বললেন, 'তোমরা বাপ-দাদার আদর্শ ত্যাগ করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শ গ্রহণ করেছো। তাঁর ভগ্নিপতি বললেন, 'আমাদের আদর্শ থেকেও অন্য আদর্শ যদি উত্তম হয় তাহলে তুমি কি করবে ওমর?'

তাঁর মুখের কথা শেষ হতেই হযরত ওমর ভগ্নিপতির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে অমানবিকভাবে প্রহার করতে শুরু করলেন। স্বামীকে বাঁচাতে এসে তাঁর বোনও ভাইয়ের হাতে রক্তাক্ত হলেন। বোনের শরীরে রক্ত দেখে হযরত ওমর যেন চমকে উঠলেন। ইতোপূর্বেই তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল, নির্যাতনের মুখেও তাঁর দাসী এই আদর্শ ত্যাগ করেনি। তাঁর বোন এবং ভগ্নিপতির অবস্থাও তেমনি। তাহলে কি আছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শের ভেতরে? প্রশ্নটি তাঁর ভেতরের পৃথিবীটা সম্পূর্ণ ওলট-পালট করে দিল। তিনি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন। অনুশোচনার কণ্ঠে তিনি তাঁর বোন ভগ্নিপতিকে বললেন, 'তোমরা কি পড়ছিলে আমাকে দেখাও!'

হযরত ওমরর কণ্ঠের পরিবর্তন শুনেই তাঁরা অনুভব করেছিল, ওমরের ভেতরে পরিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছে। তাঁরা জানালো, 'আমরা যা পড়ছিলাম তা মহান আল্লাহর বাণী; অপবিত্র অবস্থায় তা স্পর্শ করা যায় না।'

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পবিত্র হয়ে এসে আল্লাহর কোরআন পড়তে লাগলেন। কিছুটা পড়েই তিনি করুণ কণ্ঠে আবেদন জানালেন, 'কোথায় আল্লাহর

রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।' হযরত ওমরের এই কথা শুনে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু গোপন স্থান থেকে বের হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে আনন্দিত কণ্ঠে বললেন, 'হে ওমর! আনন্দের সংবাদ গ্রহণ করো, তোমার জন্য আল্লাহর রাসূল দোয়া করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের দোয়া কবুল করেছেন। তিনি এখন সাফা পাহাড়ের ওপরে আরকামের বাড়িতে অবস্থান করছেন।'

হযরত ওমর দারে আরকামের দিকে চলেছেন। হযরত হামজা ও হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম সে সময় দারে আরকামের দরজায় কিছু সংখ্যক মুসলমানসহ প্রহরা দিচ্ছিলেন। হযরত ওমরকে কাঁধে তরবারী ঝুলিয়ে আসতে দেখে তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। হযরত হামজা সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'তাকে আসতে দাও, আল্লাহ যদি ওমরের কল্যাণ করেন তাহলে সে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করবে, আর যদি সে অন্য উদ্দেশ্যে আসে তাহলে তাঁর তরবারী দিয়েই তাকে হত্যা করা হবে।'

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সে সময় আরকামের বাড়ির ভেতরে অবস্থান করছিলেন। হযরত ওমরের আগমনের কথা জানালে তিনি প্রশান্ত চিত্তে বলেছিলেন, 'তাকে আসতে দাও।'

এরপর হযরত ওমর এসে পৌঁছলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে তাঁর তরবারীর গোড়ার দিক এবং পরনের কাপড় নিজের হাতে ধরে মমতাভরা কণ্ঠে বললেন, 'হে ওমর! তুমি কি বিরত হবে না! হে আল্লাহ! ওমর আমার সামনে, হে আল্লাহ ওমরের মাধ্যমে তুমি তোমার ইসলামকে শক্তিশালী করো।'

হযরত ওমর আল্লাহর নবীর হাতে হাত রেখে ঘোষনা দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনার জন্য আপনার কাছে এসেছি।'

হযরত ওমরের কণ্ঠে এমন ব্যাকুল আবেদন শুনে আল্লাহর নবীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বলেন, 'বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সে মুহূর্তে উচ্চকণ্ঠে আল্লাহ আকবার বলে তাকবির দিয়েছিলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামও নবীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সেদিন তাওহীদের বিজয় ঘোষনা করেছিলেন। নবী এবং সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত শ্লোগানে সেদিন পৃথিবীর সমস্ত বাতিল শক্তির ভিত্তি ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়েছিল, যা শুধু ধ্বসে পড়ার অপেক্ষায় ছিল। ইসলামের বিপ্লবী কাফেলায় শামিল হয়েই আল্লাহর সৈনিক ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঘোষনা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আর লুকোচুরি নয়, আল্লাহ বিরোধী মিথ্যে শক্তি প্রকাশ্যে তৎপরতা চালাবে, আল্লাহর ঘরে তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করবে আর আমরা

যারা মহান আল্লাহর দাসত্ব করি তাঁরা কা'বায় নামায আদায় করতে পারবো না, গোপনে নামায আদায় করবো তা হতে পারে না। চলুন আমারা প্রকাশ্যে কা'বায় মহান আল্লাহকে সেজদা করবো।'

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামী কার্যক্রম শুরু করার ছয় বছরের সময়। সে সময় হযরত ওমরের বয়স ছিল ত্রিশ-এর ওপরে এবং তেত্রিশ-এর মধ্যে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছেন এ কারণে গোটা মক্কায় একটা শোরগোল সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতিটি মানুষের মুখে ছিল সেই আলোচনা। ব্যাপারটি আল্লাহর সৈনিকদের কাছে পরম খুশীর হলেও আল্লাহদ্রোহীদের কাছে তা ছিল একেবারে অবিশ্বাস্য। তাঁরা হতবাক হয়ে পড়েছিল। এই শোরগোল শুনে বীর কেশরী আস ইবনে ওয়াঈল এসে সমবেত কুরাইশদের কাছে জানতে চাইলো, 'কি হয়েছে তোমাদের, এত হৈ চৈ করছো কেন?'

কুরাইশরা তাকে জানালো, 'সর্বনাশের সংবাদ হলো ওমর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দলে ভিড়েছে।' এ সংবাদ শুনে আস ইবনে ওয়াঈল বললো, 'ওমর ঠিকই করেছে। আমি তাকে আশ্রয় দিলাম।' স্বয়ং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করে সে রাতেই চিন্তা করলাম মক্কায় ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু কে আছে, তাকেই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানাবো। আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়লো ইসলামের বড় শত্রু হলো আবু জেহেল। পরদিন সকালে আমি আবু জেহেলের বাড়িতে চলে গেলাম। তাঁর ঘরের দরোজায় করাঘাত করে তাকে ডাকলাম। সে দরোজা খুলে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, ওমর! তুমি আমার কাছে এত সকালে কি মনে করে এসেছো? আমি তাকে বললাম, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি। আমার কথা শুনে আবু জেহেল বললো, আল্লাহ তোকে কলঙ্কিত করুক এবং যে সংবাদ নিয়ে তুই এসেছিস তাকেও কলঙ্কিত করুক। এই কথাগুলো বলতে বলতে সে আমার মুখের ওপরে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

## রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বন্দী জীবন

মক্কার ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দের আপন ঘরেই ইসলামের রক্ষক প্রস্তুত হলো। বড়বড় নেতাদের আপন সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। শুরু থেকে এত বাধা এত প্রতিরোধ, লোমহর্ষক নির্যাতনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রবল গতিতে ইসলাম তার আপন লক্ষ্য পানে দুর্বার বেগে অগ্রসর হচ্ছিল। মক্কার দুই প্রধান বীর হযরত হামজা ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম ইসলাম কবুল করে

ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইসলাম তখন যেনো মক্কার ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। এ অবস্থায় কাফিরা ইসলাম ও মুসলমান এবং তাদের প্রতি যারা সহানুভূতিশীল তাদের বিরুদ্ধে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। বনী হাশিম এবং বনী আবদিল মুত্তালিব বংশ ছিল বিশ্বনবীর প্রতি সহানুভূতিশীল। সুতরাং এই দুই গোত্রের মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই অন্যান্য গোত্রের শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। কারণ অন্যান্য গোত্র এই দুই গোত্রের কাছে দাবী করেছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আমাদের হাতে উঠিয়ে দেয়া হোক, তাকে আমরা হত্যা করি। তাহলে তাঁর ইসলামের বিপ্লবী কার্যক্রম এমনিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সে দাবী ঐ দুই গোত্র গ্রহণ করেনি।

তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং ঐ দুই গোত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক ঘৃণ্য চুক্তিনামা প্রস্তুত করলো। সে চুক্তিতে লিখিত ছিল, 'মুহাম্মদ (সাঃ) বনী হাশিম এবং বনী আবদিল মুত্তালিবের সাহায্য সহযোগিতায় কুরাশদেরই শুধু নয়–গোটা মক্কার জাতিকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে। পক্ষান্তরে তাকে হত্যাও করা যায়নি। তাঁর আদর্শ বিজয়ী হলে মক্কার সমস্ত গোত্রের সম্মান-মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট হবে। এই ধরণের অনাকাংখিত অবস্থায় তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনিত হলো যে, বনী হাশিম এবং বনী আবদিল মুত্তালিবের মুসলিম এবং অমুসলিম কারো সাথেই কোনরূপ সম্পর্ক রক্ষা করা যাবে না। তাদের সাথে বিয়ে, ব্যবসা, ধার দেনা, কথা-বার্তা তথা কোন ধরণের সম্পর্ক রক্ষা করা যাবে না। কেউ তাদেরকে কোন খাদ্য বা পানীয় দিয়ে সাহায্য করতে পারবে না। কেউ যদি তা করে, গোপনেও কেউ যদি তাদেরকে কোন ধরণের সাহায্য সহযোগিতা করে তাহলে তাকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

সমস্ত গোত্রের পক্ষ থেকে এই চুক্তিপত্র লিখে তা কা'বার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। চুক্তিপত্র লিখেছিল মনসুর ইবনে আকরামা। যে হাত দিয়ে সে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে চুক্তিপত্র লিখেছিল, মহান আল্লাহ সে হাতের শাস্তিও তাকে দিয়েছিলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলে পক্ষাঘাত হয়েছিল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বংশের আবু লাহাব ও তাঁর পরিবার ছিল এই চুক্তির আওতার বাইরে। কারণ সে স্বয়ং ঐ ঘৃণ্য চুক্তি সম্পাদনকারীদের পক্ষে ছিল। যাদের বিরুদ্ধে চুক্তি করা হয়েছিল এই চুক্তির ফলে তাঁরা কি যে অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছিল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই চুক্তির কারণে শুধু বিশ্বনবী এবং মুসলমানরাই দুঃসহ অবস্থার ভেতরে নিপতিত হয়নি। তখন পর্যন্ত ঐ দুই গোত্রের একটি বিরাট

জনগোষ্ঠী ইসলাম কবুল করেনি, তাঁরাও বর্ণনাতীত দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে নিপতিত হয়েছিল। মুসলমানদের সাথে সাথে তাঁরাও দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অনাহারে থেকেছে, গাছের পাতা ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের শিশুগণও মুসলিম শিশুদের সাথে ক্ষুধার যন্ত্রণায় আকাশ-বাতাস দীর্ণ-বিদীর্ণ করে আর্তনাদ করেছে।

বিশ্বনবীর পক্ষের দুই গোত্র অবরোধের কবলে পতিত হবার পরে তাঁরা দ্রুত একটি বৈঠক করলো। সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, শহরে এই অবস্থায় তাঁরা বাস করতে থাকলে কোনক্রমেই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারবে না। সুতরাং অন্য কোথাও যেয়ে অবস্থান করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করা যাবে না, এতে কষ্ট বৃদ্ধি পাবে। ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাঁরা শিয়াবে আবি তালিবে গিয়ে অবস্থান করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলো। শিয়াবে আবি তালিব নামক জায়গাটা ছিল মক্কার একটি পাহাড়ের এলাকা। সেখানে বনী হাশিমের লোকজন বসবাস করতো। এলাকাটি ছিল সমস্ত দিক থেকে সুরক্ষিত পাহাড়ি দুর্গের মত। তাদের ধারণা ছিল, এখানে থাকলে তাঁরা বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করতে পারবে। এ ঘটনা ছিল নবুওয়াত লাভের সাত বছরের সময় মহরম মাসে। ঐ দুই গোত্রের মুসলিম অমুসলিম সবাই বিশ্বনবীর সাথে এই দুঃসহ অবস্থা হাসি মুখে বরণ করে নিল।

এই ধরণের বিপদ যে আসবে তা ঐ দুই গোত্র উপলব্ধি করতে পারেনি। বিপদ ছিল আকস্মিক। এ কারণে তাঁরা প্রস্তুতি গ্রহণের কোন সুযোগ পায়নি। তাদের কাছে খাদ্যদ্রব্য যা ছিল তাই নিয়ে তাঁরা পাহাড়ের ঐ দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সামান্য কয়েক দিনের ভেতরেই তাদের সমস্ত খাদ্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর তখনই বিপদ মূর্তিমান আকার ধারণ করেছিল। একটি দুটো দিন নয়—দীর্ঘ তিনটি বছর অনাহারে চরম কষ্টের ভেতরে তাদেরকে ঐ শিয়াবে আবি তালিবে বন্দী জীবন-যাপন করতে হয়েছিল।

ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সময়ে তাঁরা নিম গাছের পাতা খেয়ে পেটের ক্ষুধা নিবারণ করেছেন। পশুর শুকনো চামড়া তাঁরা আগুনে সিদ্ধ করে খেয়েছেন। মা খেতে পারেননি, ফলে তাদের বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছে, সন্তান দুধ না পেয়ে করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করেছে। গিরি দূর্গে শিশু-কিশোরগণ প্রচন্ড ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আর্ত চিৎকার করেছে আর তাদের চিৎকার শুনে ইসলাম বিরোধিরা হেসেছে। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, গাছের পাতা তাঁরা খেয়েছেন। ফলে তাদের মল পশুর মলের মত হয়ে গিয়েছিল। হযরত সায়াদ বলেন, ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না

পেরে একদিন খাদ্যের সন্ধানে বের হলাম। কোথাও কিছুই যোগাড় করতে পারলাম না। পশুর এক টুকরা চামড়া কুড়িয়ে পেলাম। তাই এনে আগুনে সিদ্ধ করে আমরা আহার করলাম।

কোন দিক থেকে কেউ যেন গিরিদূর্গে সাহায্য প্রেরণ করতে না পারে এ জন্য ইসলাম বিরোধী শক্তি যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছিল। তাঁরা পালা করে গিরিদূর্গের প্রবেশ পথসমূহে প্রহরার ব্যবস্থা করেছিল। কোন লোক যদি গিরিদূর্গ থেকে বাইরে এসে কোন জিনিস ক্রয় করার জন্য মূল্য নির্ধারণ করতো তাহলে ঠিক তখনই ইসলাম বিরোধিরা অধিক মূল্য প্রদান করে সে দ্রব্য ক্রয় করে নিত। কোন সময় দূর্গের ভেতর থেকে কোন ব্যক্তি বাইরে এলে তাকে প্রহার করে রক্তাক্ত করে দেয়া হত। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা যিনি মায়ের গর্ভ হতে এই পৃথিবীতে এসে কোন দিন অভাব শব্দের সাথে পরিচিত হননি। দিনের পর দিন তাঁকে অনাহারে থাকতে হয়েছে। ক্ষুধার যন্ত্রণা তিনি হাসি মুখে সহ্য করলেও তাঁর ভেতরটা নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। অবরোধ জীবনের অবসানের পরেই এর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। বিশ্বনবীর চাচা আবু তালিবের ভেতরেও কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ক্ষুধার দানব বিশ্বনবীর এই দুই পরম প্রিয়জন চাচা আবু তালিব আর জীবন সাথি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল।

হিশাম একদিন যুহাইর ইবনে আবু উমাইয়ার কাছে যেয়ে বললেন, 'তুমি নিজে সমস্ত দিক দিয়ে সুখে আছো। পেটভরে আহার করছো আরামে ঘুমাচ্ছো। তুমি কি জানো তোমার আত্মীয়-স্বজনগণ বন্দী অবস্থায় গিরিদূর্গে কিভাবে মানবেতর জীবন-যাপন করছে? যারা তাদেরকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছে, তাদের কোন আত্মীয়কে এভাবে যদি তুমি কষ্ট দিতে তাহলে তাঁরা কি তা মেনে নিত–না তোমার সাথে ঐকমত্য পোষণ করতো?' যুহাইর ইবনে উমাইয়ার যেন বিবেক জাগ্রত হলো। সে জবাব দিল,'একা তো আমার কোন ক্ষমতা নেই। কিছু লোকজন আমি সাথে পেলে ঐ চুক্তি বাতিল করে দিতাম?'

হিশাম বললো, 'আমি তোমার সাথে আছি, তুমিও জনসমর্থন যোগাড় করো আমিও করি।' হিশাম মুতয়িম ইবনে আদির কাছে যেয়ে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে আসল কথা উত্থাপন করলো। বললো, 'হে মুতয়িম! বনী আবদে মানাফের লোকজন অনাহারে নির্যাতন ভোগ করে মৃত্যুবরণ করবে আর তুমি কি সে দৃশ্য দেখে নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করবে? যারা আজ তাদেরকে বন্দী করে চরম নির্যাতন চালাচ্ছে, তাঁরা কাল যে তোমার ওপরে সেই ধরণের নির্যাতন চালাবে না, এর তো কোন নিশ্চয়তা নেই।'

এভাবে হিশাম বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনা করে জনমত গঠন করলেন। তারপর ঐ চুক্তির বিরুদ্ধে তিনি মক্কার হাজুন নামক এক পাহাড়ের পাদদেশে একটা সমাবেশের আয়োজন করলেন। যথা সময়ে সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো আগামী কাল সকালে তাঁরা সবাই তাদের কাছে যেয়ে প্রকাশ্যে চুক্তির প্রতি বিদ্রোহ করবে, যারা বনী হাশিম এবং বনী আবদিল মুত্তালিব গোত্রকে বন্দী রাখার পক্ষে। এ সংবাদ গিরিদূর্গেও পৌছেছিল। গোটা মক্কায় ব্যাপারটা প্রচন্ড আলোড়ন জাগালো। চুক্তির প্রতি বিদ্রোহকারী দল পরের দিন মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত হয়ে কা'বাঘরে গেল। কা'বা ঘর তাঁরা সাত বার তাওয়াফ করে উপস্থিত জনতার সামনে ভাষণ পেশ করলো।

ভাষণে তাঁরা বললো, 'মক্কার অধিবাসীগণ! আমরা পেটভরে আহার করছি, তৃষ্ণায় আকণ্ঠ পানি পান করছি। আমাদের সন্তান সন্ততিগণ ফুর্তিতে আছে। ওদিকে বনী হাশিম এবং বনী আবদিল মুত্তালিবগণ কি অবস্থায় তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করছে তা কি আমরা অনুভব করেছি? তাদের সাথে কেউ কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না এটা চলতে দেয়া হবে না। মহান আল্লাহর শপথ! আমরা এমন চুক্তি মানিনা, যে চুক্তির বলে মানুষ অত্যাচাচিত হয়। এই চুক্তি আমরা অবশ্যই ছিড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলবো।'

আবু জেহেল প্রতিবাদ করে বললো, 'তোমরা মিথ্যা কথা বলছো, ঐ চুক্তি বাতিল করা হবে না।' চুক্তির প্রতি বিদ্রোহী দল সমস্বরে তীব্র প্রতিবাদ করে বললো, 'মিথ্যাবাদী তুমি। এই চুক্তি আমরা মানিনা। আমরা আল্লাহর কাছে এই চুক্তির সাথে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করছি এবং আমাদের পক্ষ থেকে এই চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করছি।'

দুই পক্ষে চুক্তি বাতিল বা বহাল রাখা নিয়ে ভীষণ ঝগড়ার সৃষ্টি হলো। ওদিকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবকে প্রেরণ করেছিলেন গোপন একটা কথা বলে। উভয় দলে যখন মারামারি হবার উপক্রম হলো তখন আবু তালিব এসে বললেন, 'তোমরা যে চুক্তি করেছো তা আল্লাহর পছন্দ নয়। আমার কথা সত্য না মিথ্যা তা তোমরা প্রমাণ করে দেখতে পারো। তোমরা ঐ চুক্তি পত্র দেখতে পারো। দেখো তা পোকায় খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। আমার কথা যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কোন রূপ সহযোগিতা করবো না। আর আমার কথা যদি সত্য হয় তাহলে সমস্ত অবরোধের অবসান এখানেই ঘটবে।'

এ সময়ে মুতয়িম নামক চুক্তি বিরোধী একজন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে চুক্তি পত্রটা কা'বার দেয়াল থেকে নিয়ে এলো। দেখা গেল আল্লাহর নাম লিখা অংশটুকু ব্যতীত আর

সমস্ত অংশ পোকায় খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। ইসলাম বিরোধিরা তখন বাধ্য হয়েছিল লজ্জায় মুখ ঢাকতে কিন্তু এত বড় নিদর্শন দেখেও মহাসত্য গ্রহণ তাদের ভাগ্যে হলোনা। চুক্তির বিরোধিরা বিজয়ী হলো, তাঁরা নিজেরা অগ্রসর হয়ে গিরিদূর্গ থেকে সবাইকে মুক্ত করে আনলেন। মক্কার কয়েকজন যুবক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রহরা দিয়ে কা'বায় এনেছিল। তিনি সেখানে নামায আদায় করেছিলেন। এই বন্দী দশায় থাকতেই বিশ্বনবীর চাচা হযরত আব্বাসের এক স্ত্রীর গর্ভে হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চাচা তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করলেও চাচী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সন্তান প্রসব করার পরে তিনি সে সন্তান এনে রাসূলের কাছে দিলেন। বিশ্বনবী সে সন্তান অর্থাৎ তাঁর চাচাত ভাইয়ের মুখে নিজের পবিত্র মুখের লালা দিয়েছিলেন। এমনই এক মহাভাগ্যবান শিশু ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম যে, পৃথিবীতে এসে মায়ের স্তন পান করার আগে আল্লাহর নবীর মুখের পবিত্র লালা মোবারক পান করেছিলেন। আল্লাহর নবী তাঁর জন্য প্রাণভরে দোয়া করতেন। শিশু আব্দুল্লাহকে তিনি খুবই আদর করতেন। সবসময় নিজের কাছেই রাখতেন। কিন্তু হিজরতের সময় বছর কয়েকের জন্য এই শিশুর সাথে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটলেও আল্লাহর কুদরত তাদেরকে আবার এক করে দিয়েছিল। সাহাবায়ে কেরামদের ভেতরে তাঁর মত স্মৃতি শক্তি এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী, পবিত্র কোরআনের সুক্ষাতিসুক্ষ বিষয় উদ্ঘাটনকারী আর একজনও ছিল না।

## রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি তায়েফবাসীদের অত্যাচার

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে বাড়িতে থাকতেন সে বাড়ির চারদিকে যারা বসবাস করতো, অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের প্রতিবেশী যারা ছিল তাদের ভেতরে একমাত্র হাকাম ইবনে আ'স ব্যতীত আর কেউ ইসলাম কবুল করেনি। বিশ্বনবী যখন নিজের বাড়িতেই নামাযে দাঁড়াতেন তখন প্রতিবেশী উকবা, আদী এ ধরণের অনেকেই তাঁর ওপরে পশুর নাড়ি ভুড়ি ছুড়ে দিত। আল্লাহর নবী বাধ্য হয়ে একটা দেয়ালের আড়ালে নামায আদায় করতেন। তিনি রান্নার জন্য চুলায় হাড়ি উঠাতেন আর তাঁরা সেই হাড়ির ভেতরেও আবর্জনা ছুড়ে দিত। বিশ্বনবী নিজ হাতে সেসব আবর্জনা পরিষ্কার করতেন। এভাবে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও আবু তালিবের অভাবে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কাফেরের দল তাঁর নিজ বাড়ির ভেতরেও নির্যাতন করেছে। সে সমস্ত ঘটনা ইতিহাসের কালো অধ্যায় হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে আছে।

আল্লাহর  নবী মক্কায় যেন আর টিকতে পারেন না। মক্কায় ইসলাম বিরোধিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। তাদের এই অত্যাচার থেকে কিভাবে মুক্ত থাকা যায় তিনি সে সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকলেন। অবশেষে তিনি চিন্তা করলেন, তায়েফের আবদে ইয়ালিল, মাসউদ ও হাবিব এই তিনজন যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে ইসলামী কাফেলার ওপর মক্কার কাফিররা অত্যাচার করতে সাহস পাবে না। উল্লেখিত তিন ব্যক্তি ছিল তায়েফের সবচেয়ে প্রভাবশালী গোত্র সাকিফ গোত্রের তিন ভাই। তাঁরাই ছিল গোত্র প্রধান। এই তিনজন লোক যদি ইসলামের পক্ষে আসে তাহলে ইসলামী আন্দোলন অনেক শক্তিশালী হবে। তাদের মাধ্যমে আরো বড়বড় নেতাদের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছে দেয়া যাবে। এ সবদিক চিন্তা করে আল্লাহর নবী হযরত যায়েদকে সাথে নিয়ে পায়ে হেঁটে তায়েফ রওয়ানা দিলেন।

তায়েফের ঐ নেতা তিন ভাইয়ের একজন মক্কার কুরাইশ বংশের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামও ছিলেন কুরাইশ বংশের, সুতরাং তাঁরা ছিল কুরাইশদের আত্মীয়। তাঁরা ইচ্ছা করলে নবীকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে। এই আশায় তিনি তায়েফ গমন করলেন। কিন্তু তাকদির ছিল ভিন্ন ধরণের। তিনি তাদের কাছে গেলেন। তাদের তিন ভাইকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝালেন। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।

তিনি তাদেরকে ইসলাম সম্পর্ক বুঝিয়ে অনুরোধ করলেন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করা দূরে থাক, বিশ্বনবীকে অপমান করলো। একজন বললো, 'তোমাকেই আল্লাহ যদি রাসূল করে প্রেরণ করে থাকে তাহলে আল্লাহ কা'বা শরীফের গেলাফ খুলে ফেলুক।' এই হতভাগার কথার তাৎপর্য ছিল, আল্লাহ তাকে নবী বানিয়ে কা'বার মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছেন।

দ্বিতীয়জন বললো, 'তোমাকে ব্যতীত আর কাউকে কি আল্লাহ রাসূল বানানোর লোক খুঁজে পেলেন না?'

তৃতীয়জন বললো, 'তুমি যদি তোমার দাবী অনুযায়ী সত্যই রাসূল হয়ে থাকো তাহলে তোমার সাথে কথা বলা বিপদজনক। আর যদি তোমার দাবীতে তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমি কোন মিথ্যাবাদীর সাথে কথা বলতে ইচ্ছুক নই, এ কারণে তোমার সাথে আমি কোন কথা বলতে চাইনা।'

এসব কথা বলে তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। তাঁরা নবীর কথা সমস্ত লোকজনের ভেতরে বিদ্রুপের ভাষায় প্রকাশ করে দিল এবং এলাকার মূর্খ ও দুষ্ট লোকদেরকে নবীর পেছনে লেলিয়ে দিল। এসব লোক নবীর পেছন পেছন যেতে লাগলো আর তাকে বিদ্রুপ করতে লাগলো। তিনি যেদিকেই যান সেদিকেই তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে উৎপাত করতে থাকলো।

আল্লাহর নবী দীর্ঘ দশ দিন যাবৎ তায়েফে অবস্থান করে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ইসলাম বিরোধিরা অবশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে রাস্তা দিয়ে যাবেন সে রাস্তার দু'দিকে পাথর হাতে দাঁড়িয়ে গেল। ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, পাষন্ডের দল বৃষ্টির আকারে তাঁর ওপরে পাথর বর্ষণ করতে থাকলো। আল্লাহর নবী রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়লেন। তায়েফের জালিমরা নবীর পবিত্র পা দুটো লক্ষ্য করেই আঘাত করেছিল বেশী। আল্লাহর নবী যখন হাঁটার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন তখন তিনি জ্ঞানহারা হয়ে রাস্তায় পড়ে গেলেন। এ অবস্থাতেও নিষ্ঠুর তায়েফবাসী পাথর বর্ষণ অব্যাহত রাখলো। আল্লাহর নবীর এই অবস্থা দেখে হযরত যায়েদ তাঁর ওপর থেকে পাথর সরিয়ে তাঁকে উঠালেন।

নবীকে সাহায্য করতে গিয়ে হযরত যায়েদও মারাত্মকভাবে আহত হলেন। আল্লাহর নবী হাঁটতে পারছেন না। কোন মতে অবশ পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌছলো যে, নবীর জীবন নাশের আশংকা দেখা দিল। হযরত যায়েদ নবীকে নিয়ে দেয়াল ঘেরা একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের তখন জ্ঞানহীনের মত অবস্থা। হযরত যায়েদের সেবা-যত্নে তিনি একটু সুস্থ হয়েই তাঁকে বললেন নামাযের কথা। নামাযের প্রস্তুতির জন্য তিনি পায়ের জুতা খুলতে গেলেন। পারলেন না। পবিত্র রক্ত জুতায় প্রবেশ করে পায়ের সাথে জুতা এমনভাবে বসে গেছে যে জুতা মোবারক খুলতে কষ্ট করতে হলো।

এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আমি দুর্বল, আমি অক্ষম, আমি সহায় সম্বলহীন, আমার বিচক্ষণতার অভাব। মানুষ আমাকে অবজ্ঞা করে, আমাকে নগন্যভাবে, আমাকে উপেক্ষা করে এ জন্য আমি আপনার কাছে আবেদন করছি। যারা দুর্বল এবং সহায় সম্বলহীন আপনিই তাদের আশ্রয়দাতা প্রতিপালক। হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতিপালক। আপনি মানুষের নিষ্ঠুরতা আর করুণাহীনতার ওপরে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছেন? যে আমাকে শত্রু জ্ঞান করে আমার ওপর অত্যাচার করে আপনি তাঁর ওপর আমাকে ছেড়ে দিচ্ছেন? আপনি যদি আমার ওপর রহম করেন আমাকে নিরাপত্তাদান করেন তাহলে এটাই হবে আমার জন্য শান্তির কারণ। আমি আপনার সেই রহমতের আশ্রয় কামনা করি, যে রহমতের কারণে সমস্ত পৃথিবী উৎসব মুখর হয় এবং পৃথিবী ও আখিরাতের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। আমার অক্ষমতার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার সাহায্য ব্যতীত আমি কোন কাজ সমাধা করতে পারবো না।'

এভাবেই আল্লাহর নবীকে তায়েফ থেকে হতাশ আর অত্যাচারিত হতে হয়েছিল। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বিশ্বনবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

'কোথায় আপনার ওপরে সবচেয়ে বেশী নির্যাতন করা হয়েছে?' আল্লাহর নবী তাকে জানিয়েছিলেন তায়েফের কথা। এ ধরণের নির্মম নির্যাতন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবনে আর কোথাও ঘটেনি। তিনি তায়েফ থেকে ফিরে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন।

## ইসলামের দুশমন আবু জাহিলের শেষ পরিণতি

ইসলামের কঠোর শত্রু এবং মক্কায় অবস্থানের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছে আবু জাহিল– মদীনায় এ কথা এমনভাবে প্রচারিত হয়েছিল যে, মদীনার একজন মুসলিম শিশুও তার নাম জানতো। মদীনার আনসারদের দুই কিশোর সন্তান, হযরত মুয়াব্বিজ ও হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম, তাঁরা ছিলেন আপন দুই ভাই। এই দুই ভাই প্রতীজ্ঞা করেছিল, রাসূলকে যে ব্যক্তি বেশী কষ্ট দিয়েছে, সেই আবু জাহিলকে তাঁরা হত্যা করবে আর না হয় তাঁরা শাহাদাতবরণ করবে। বোখারী হাদীসের কিতাবুল মাগাযীতে বদরের যুদ্ধের দিনের কথা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'আমি এক সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার দুই পাশে ছিল কিশোর দুইটি ছেলে। আমার কেমন যেন বিব্রত বোধ হচ্ছিল, আমার দুই পাশে দুটি কিশোর ছেলে, বয়স্ক কোন বীর নেই! এক পাশের একজন আমার কানের কাছে মুখ এনে জানতে চাইলো, আবু জাহিল লোকটি কে। অপর পাশের কিশোরটিও আবু জাহিলের পরিচয় জানতে চাইলো। তখন আমার জড়তার ভাব কেটে গেল। আমার মনে হলো, আমি দুইজন বীরের মাঝেই দাঁড়িয়ে আছি।'

হযরত আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আবু জাহিলকে তোমাদের কি প্রয়োজন?' তাঁরা জানালো, 'আমরা আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেছি, আবু জাহিলকে হত্যা করবো অথবা শহাদাতবরণ করবো।'

এরপর হযরত আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাদের দুই ভাইকে ইশারা দিয়ে দেখিয়ে দিলেন আবু জাহিলকে। আবু জাহিলকে দেখার সাথে সাথে দুই ভাই তীর বেগে ছুটে গেল তার কাছে। তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লো আল্লাহর শত্রুর ওপরে। আবু জাহিল মাটিতে পড়ে গেল। তাকে রক্ষার জন্য তার সন্তান দ্রুত এগিয়ে এসে তরবারীর আঘাত করলো। হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বাম হাতটি এমনভাবে কেটে গেল যে, সে কাটা হাতটি কাঁধের সাথে ঝুলতে লাগলো।

এই ঝুলন্ত হাত নিয়ে কিশোর এই সাহাবী আবু জাহিলের সন্তানের সাথে যুদ্ধ করে তাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করলেন। ঝুলন্ত হাত যুদ্ধ করতে অসুবিধার সৃষ্টি করছিল। কিশোর সাহাবী হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর ঝুলন্ত হাত

পায়ের নীচে ফেলে আল্লাহু আকবার বলে গর্জন করে একটানে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বাচ্ছন্দে যুদ্ধ করতে থাকলেন। এই দুই সিংহ সাবক ছিলেন আফরা নামক এক বীরাঙ্গনা নারীর সন্তান।

বদরের প্রান্তরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদেরকে বিজয়দান করার পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, 'এমন কেউ আছে কি, যে ব্যক্তি আবু জাহিলের পরিণতি দেখে আসবে?'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দ্রুত ছুটে গেলেন যুদ্ধের ময়দানে। তিনি দেখলেন, মৃতদেহের মধ্যে আবু জাহিল মারাত্মক আহত অবস্থায় পড়ে আছে। ঘনঘন নিশ্বাস ছাড়ছে আল্লাহর এই দুশমন। বোখারী হাদীর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আবু জাহিলের দাড়ি ধরে জানতে চাইলেন, 'তুমিই কি আবু জাহিল?'

আল্লাহর দুশমন জবাব দিল, 'সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম আর কে আছে, যাকে তার বংশের লোকজন হত্যা করলো।' কোন একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে আবু জাহিল থাপ্পড় মেরেছিল। সে কথা হযরত আব্দুল্লাহর স্মরণে ছিল। তিনি আবু জাহিলের ঘাড়ে পা রাখলেন। আবু জাহিল বললো, 'এই ছাগলের রাখাল! দেখ তুই কোথায় তোর পা রেখেছিস?'

এরপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলামের এই শত্রুর মাথা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। তারপর সে মাথা আল্লাহর রাসূলের সামনে এনেছিলেন। তিনি বলেন, 'আফরার দুই সন্তান আবু জাহিলকে মারাত্মকভাবে আহত করে ফেলে রেখেছিল। আমারও প্রতীজ্ঞা ছিল আমি তাকে হত্যা করবো। আমি তার মাথা কেটে আল্লাহর নবীর সামনে এনে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা আল্লাহর দুশমন আবু জাহিলের মাথা।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'সত্যই কি এটা আবু জাহিলের মাথা!' আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম, এটা আবু জাহিলের মাথা।' এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন। পরবর্তীতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ নেতৃবৃন্দের লাশ কুয়ায় নিক্ষেপ করতে আদেশ করেছিলেন। তিনি গভীর রাতে সেই কুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে নিহত কাফির নেতৃবৃন্দের নাম ধরে ডেকে ডেকে বলছিলেন, 'আল্লাহ তোমাদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তোমরা যথাযথভাবে লাভ করেছো। আমিও আমার রবের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে লাভ করেছি।'

সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মৃত ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করে বলছেন, তারা কি আপনার কথা শুনতে পাবে?' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা যেমন আমার কথা শুনতে পাচ্ছো, তারাও তেমনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু কোন সাড়া দিতে পারছে না।'

অনেকে আল্লাহর রাসূলের কথার ভুল অর্থ করেছেন যে, সমস্ত মৃত ব্যক্তি পৃথিবীর মানুষের কথা শুনতে পায় কিন্তু কোন জবাব দিতে পারে না। মাজার পূজারীরা ধারণা করে তাদের কথা মাজারে শায়িত ব্যক্তি শুনতে পায়। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে, তাঁরা তোমাদের কোন লাভ ক্ষতি কিছুই করতে পারে না। তাদের পরিণতি কি হবে, এ কথা তাঁরা নিজেরাই জানে না।

তবে মহান আল্লাহ যদি মৃত কোন মানুষকে কিছু শোনানোর ব্যবস্থা করেন, তাহলে সেটা ভিন্ন বিষয়। ইসলামের দুশমনদের লক্ষ্য করে আল্লাহর নবী যে কথা বলেছিলেন, সে কথাগুলো মহান আল্লাহ তাদেরকে শোনার মত ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এ কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, 'আমার কথা তোমরা যেমন শুনতে পাচ্ছো, ওরাও তেমনি আমার কথা শুনতে পারছে কিন্তু কোন জবাব দিতে পারছে না।

## যুদ্ধবন্দীদের সাথে মুসলমানদের আচরণ

মক্কায় যারা ইসলাম বিরোধী নেতা হিসাবে পরিচিত ছিল, তাদের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দই বদরের প্রান্তরে নিহত হয়েছিল। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবায়ে কেরামকে প্রেরণ করেছিলেন, কুরাইশ সৈন্য সংখ্যা এবং কোন কোন নেতা যুদ্ধে এসেছে, তাদের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য। তাঁরা অনুসন্ধান করে এসে আল্লাহর নবীকে জানানোর পতে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'মক্কা তার কলিজার টুকরাগুলোকে তোমাদের সামনে প্রেরণ করেছে।' এরা প্রায় সবাই নিহত হয়েছিল।

বদর যুদ্ধের ব্যাপারে ইউরোপের গবেষকরা শুধু বিস্ময়ই প্রকাশ করেন, প্রকৃত সত্যের দিকে তাদের ভোগবাদী দৃষ্টি নিপতিত হয় না। অর্থবল নেই, জনবল নেই, যুদ্ধের রসদ নেই, তেমন কোন প্রস্তুতি নেই, সৈন্য সংখ্যা সামান্য, সৈন্যদের হাতে পর্যাপ্ত অস্ত্র নেই, যুদ্ধ সম্পর্কে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, মক্কার কুরাইশদের ছিল তিনগুন বেশী সৈন্য, তাদের একশত অশ্বারোহী বাহিনী ছিল, প্রচুর উট ছিল, তাদের সাথে ছিল বড়বড় ধনী ব্যক্তি, তারা প্রচুর রসদ পত্র যোগান দিয়েছিল। মুসলমানদের অশ্ব ছিল মাত্র দুটো। কুরাইশরা প্রায় সবাই ছিল লৌহ বর্মে অচ্ছাদিত। মুসলমানদের তেমন কোন বর্ম ছিল না।

সুতরাং কিভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধে বিজয়ী হলেন, এটা ইউরোপের গবেষকদের কাছে বিস্ময়ের বিষয়। অথচ মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন, কিভাবে তিনি বদরের প্রান্তরে ইসলামের বাহিনীকে সাহায্য করেছেন। নাস্তিক্যবাদ আর বস্তুবাদী দৃষ্টিতে বিচার করলে বিস্ময়ই শুধু জাগবে, আল্লাহর সাহায্য কিভাবে এসেছিল তা দেখা যাবে না। যুদ্ধে যাত্রা করার সময় থেকেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর কাছে বারবার আকুল আবেদন করছিলেন, আজ যদি তুমি সাহায্য না করো তাহলে তোমার এই যমীনে তোমার দাসত্ব করার মত একটি লোকও অবশিষ্ট থাকবে না।

তাঁর দোয়া আল্লাহ কবুল করলেন। একদিকে ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। ইসলামের শত্রুদের দৃষ্টিতে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা তাদের তুলনায় কয়েক গুন বৃদ্ধি করে দিলেন। তারা যখন মুসলিম বাহিনীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতো, তখন তাদের কাছে মনে হত, মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা কয়েক হাজার। এই বাহিনীর দিকে তাকালে তাদের বুকের ভেতর কেঁপে উঠতো। তারা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়তো।

তারা অবস্থান গ্রহণ করেছিল এমন এক স্থানে, সামরিক দিক দিয়ে সে স্থানের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মুসলমানদের অবস্থান ছিল বিপদজনক। তাদের পা বালুর ভেতরে ধ্বসে যাচ্ছিল। আল্লাহ সাহায্য হিসাবে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। কুরাইশদের পায়ের নীচে কাদা হয়ে গেল। এ কারণে তাদের উট আর ঘোড়া এবং স্বয়ং তারা চলতে ফিরতে পারছিল না। আর মুসলমানদের পায়ের নীচে বালু জমে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে মুসলমানদের চলা ফেরা হয়ে পড়েছিল আরামদায়ক।

প্রথম থেকেই তাদের ভেতরে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। স্বয়ং সেনাপতি ওৎবা যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিল না। অনেকে যুদ্ধ না করে ফেরৎ গিয়েছিল। তাদের নিজেদের বিশৃংখলার কারণেই তাদের ভেতর মানসিক শান্তি ছিল না। ফলে যুদ্ধের পূর্ব রাতে তাদের কারোই ভালো ঘুম হয়নি। মুসলিম বাহিনী রাতে ছিল ঘুমে বিভোর। এ কারণে যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের শরীরকে আল্লাহ সতেজ রেখেছিলেন। এভাবেই মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে সাহায্য করেছিলেন।

যুদ্ধ অবসানে দেখা গেল, মুসলমানদের পক্ষে শাহাদাতবরণ করেছেন মাত্র ১৪ জন। মক্কা থেকে হিজরতকারী মুসলমান অর্থাৎ মোহাজের ৬ জন এবং মদীনার আনসার ৮ জন। আর কুরাইশদের বিখ্যাত যোদ্ধা এবং বড়বড় বীরগণ প্রথমেই ধরাশায়ী হয়েছিল। তারা একে একে কাটা কলা গাছের মতই ধূলি শয্যা গ্রহণ করেছিল। মক্কার কুরাইশরা যাদের নিয়ে গর্ব অহংকার করতো, তারা সবাই নিহত হবার পরে তাদের মানসিক শক্তি আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

তাদের প্রায় ৭০ জন নিহত হয়েছিল এবং ৭০ জন বন্দী হয়েছিল। এই বন্দীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল হিজরতকারী মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ের স্বামী ও তাঁর চাচা আব্বাস। আপন চাচাত ভাই আকিল। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বড় ভাই এবং আবু তালিবের সন্তান। বন্দীদের মাঝে আরেকজন ছিল, তার নাম হলো সুহাইল ইবনে আমর। এই লোকটি ছিল উঁচু স্তরের বাগ্মী এবং কবি। সে জনসমাবেশ আহ্বান করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে নানা ধরণের বাজে কথা বলতো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে দেখে প্রচন্ড রেগে গেলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ঐ লোকটির নীচের মাড়ির দাঁত উপড়ে ফেলা হোক, যেন তার জিহ্বা বের হয়ে আসে এবং সে ভালোভাবে কথা বলতে না পারে।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, 'আমি নবী, আমি নবী হয়ে যদি কারো চেহারা বিকৃত করে দিই, তাহলে আল্লাহ আমার চেহারা বিকৃত করে দিবেন।'

ক্ষমার কি অপূর্ব দৃষ্টান্ত! পরম শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছুই বললেন না। 'আমার বিরুদ্ধে তুমি কেন কুৎসা ছড়াতে' সামান্য এই কথাটিও তিনি জিজ্ঞাসা করলেন না। ইসলাম শক্তি প্রয়োগ করে তরবারীর জোরে আসেনি, ইসলাম এসেছে তার অনুপম আদর্শ দিয়ে, নিজের আপন বৈশিষ্টের কারণে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বসলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন ইসলামী নীতিমালার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। তিনি ন্যায়ের খাতিরে সামান্যতম অনুকম্পা প্রদর্শন করতেন না। তিনি পরামর্শ দিলেন, 'সবাইকে হত্যা করা হোক। যার যে আত্মীয় সে তাকেই হত্যা করবে।'

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পরামর্শ দিলেন, 'বন্দীদের সবাই আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন। সুতরাং তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে মুক্তি দেয়া হোক।' তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যুদ্ধবন্দীদের ভাগ করে দিয়ে বললেন, 'এদের সাথে মমতাপূর্ণ ব্যবহার করবে। তাদেরকে আরামের সাথে রাখবে।'

আল্লাহর নবী হযরত আবু বকরের মতামত গ্রহণ করলেন। বন্দীদের কাছ থেকে এক হাজার দিনার থেকে চার হাজার দিনার পর্যন্ত গ্রহণ করে মুক্তি দেয়া হলো। যারা

মুক্তিপণ দিতে অপারগ ছিল, তাদেরকে এমনিতেই মুক্তি দেয়া হয়েছিল। এই ধরণের অপারগ ব্যক্তিদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানতো, তাদেরকে শর্ত দেয়া হয়েছিল, তারা দশজন মুসলমানকে লেখাপড়া শিখাবে তারপর তারা মুক্তি পাবে। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বদরের যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকেই লেখাপড়া শিখেছিলেন।

প্রথমে সমস্ত বন্দীদের এনে বেঁধে রাখা হয়েছিল। রাসূলের চাচা বা আত্মীয় বলে কারো প্রতি স্বজন প্রীতি দেখানো হয়নি। রাসূলের চাচা বাঁধনের কারণে যন্ত্রণায় বোধ হয় মাঝে মাঝে কাতর শব্দ করছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচার সে কষ্ট কাতর ধ্বনি শুনে রাতে ঘুমাতে পারলেন না। চাচার জন্য মনটা তাঁর ব্যথা কাতর হয়ে উঠলো। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর মনের অবস্থা অনুভব করে হযরত আব্বাসের বাঁধন শিথিল করে দিয়েছিলেন।

যুদ্ধ বন্দীদের সাথে যে অপূর্ব ব্যবহার করেছিল মুসলমানগণ, ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই। বন্দীদের মধ্যে হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর আপন ভাই আবু আজীজও ছিলেন। তার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এক আনসারীর ওপর। তিনি বলেন, 'আমাকে যে আনসারের তত্ত্বাবধানে দেয়া হয়েছিল, তার ব্যবহারে আমি নিজেই লজ্জিত হতাম। তিনি নিজে না খেয়ে আমাকে খাওয়াতেন। তিনি নিজে খেজুর খেতেন আর আমাকে রুটি খাওয়াতেন। আমি তাঁর হাতে রুটি দিলে তা তিনি আমাকে ফেরৎ দিতেন। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন, বন্দীদের সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য।'

আল্লাহর নবীর চাচার ব্যাপারে মদীনার আনসাররা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার চাচার মুক্তিপণ আমরা ত্যাগ করছি। আমরা এমনিতেই তাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছুক।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথায় রাজী হননি। অন্যান্য বন্দীদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত ছিল, নবীর চাচা হবার কারণে হযরত আব্বাসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হলো না। আল্লাহর নবীর আইন সবার জন্যই ছিল সমান। তাঁর কাছে থেকেও মুক্তিপণ আদায় করে তবেই তাঁকে ছাড়া হয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ের স্বামী অর্থাৎ নবীর জামাই আবুল আসকেও মুক্তিপণ ব্যতীত মুক্তি দেয়া হয়নি। তাঁর কাছে সে সময় মুক্তিপণের অর্থ ছিল না। তিনি মক্কায় সংবাদ দিয়ে মুক্তিপণ নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে যয়নাব তখন মক্কায়। তিনি তাঁর স্বামীর জন্য

মুক্তিপণের যে সম্পদ প্রেরণ করেছিলেন, তার মধ্যে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার গলার হার ছিল। তিনি মেয়ের বিয়ের সময় তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই হার দেখে চিনতে পারলেন। এই হার তাঁর দুঃখের দিনের জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার।

আল্লাহর নবী তাঁর প্রিয় স্ত্রীর কথা স্মরণ করলেন। ইসলামের জন্য খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা কি ত্যাগই না স্বীকার করেছেন। গোটা মক্কার সম্পদশালী নারী, ইসলামের জন্য শিয়াবে আবু তালিবে দিনের পর দিন না খেয়ে থেকেছেন। সমস্ত কথাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে পড়লো। তিনি চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না। আজ খাদিজা তাঁর সামনে নেই, খাদিজার ব্যবহার করা কণ্ঠহার তাঁর সামনে। শত সহস্র স্মৃতি নবীর বুকের ভেতরটা নাড়া দিয়ে গেল। অদম্য অশ্রুধারা বিশ্বনবীর দু'চোখ থেকে ঝরতে থাকলো।

আল্লাহর নবী তাঁর সাহাবায়ে কেরামের কাছে আবেদন করলেন, 'যদি তোমাদের মনে চায় তাহলে যয়নাবের মায়ের এই স্মৃতি তাঁর কাছেই ফেরৎ পাঠিয়ে দাও।'

সাহাবায়ে কেরাম সন্তুষ্ট চিত্তে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার সেই হার তাঁরই মেয়ে হযরত যয়নাবের কাছে ফেরৎ পাঠালেন। আবুল আস মুক্তি লাভ করে মক্কায় এসে হযরত যয়নাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে মদীনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। আবুল আস ছিলেন মক্কার বিখ্যাত ব্যবসায়ী। বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁর কাছে অর্থ দিত সিরিয়া থেকে মালামাল নিয়ে আসার জন্য।

একবার তিনি সিরিয়া থেকে নিজের এবং অন্যান্য লোকদের মালামাল নিয়ে আসার পথে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হলেন। তিনি কোন রকমে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে মদীনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত যয়নাবের শরণাপন্ন হলেন। হযরত যয়নাব তাকে আশ্রয় দিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী হযরত যয়নাবের কাছে তাঁর মালামাল ফেরৎ পাবার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করলেন।

তাঁর ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পর্যন্ত কিছুই জানতেন না। আল্লাহর নবী ফজরের নামাযে মসজিদে আগমন করলেন। নামায আদায় শেষ হলে নারীদের স্থান থেকে হযরত যয়নাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ঘোষনা করলেন, 'উপস্থিত জনমন্ডলী! আমি আবুল আস ইবনে রাবীকে আশ্রয় দিয়েছি।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি যে কথা শুনলাম তোমরা কি তা শুনতে পেয়েছো?'

উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা শুনতে পেয়েছি।' আল্লাহর নবী বললেন, 'মহান আল্লাহ সাক্ষী, এই ঘোষনা শোনার আগে আমি ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। চুক্তি অনুসারে যে কোন ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।'

এরপর তিনি তাঁর মেয়ের কাছে গিয়ে বললেন, 'তুমি তাকে যত্ন করে রাখো, কিন্তু সে যেন তোমার কাছে নির্জনে আসতে না পারে। কারণ, এখন তুমি তাঁর জন্য বৈধ নও।'

এরপর আল্লাহর নবী তাদের কাছে সংবাদ প্রেরণ করলেন ঐ সকল মুসলিম সৈন্যের কাছে, যারা আবুল আসের মালামাল হস্তগত করেছিলেন। তিনি তাদেরকে জানালেন, 'আবুল আসের সাথে আমাদের কি সম্পর্কে তোমরা তা জানো। তোমরা তাঁর মালামাল হস্তগত করেছো। তোমরা যদি দয়া করে তাঁর সম্পদ ফেরৎ দাও তাহলে তা দিতে পারো। আর যদি না দাও তাহলে তা তোমাদের জন্য গণিমতের সম্পদ হিসাবে বৈধ। ঐ সমস্ত সম্পদের আইনগত অধিকার তোমাদের। তোমরা তা রেখে দিতে পারো।'

মুসলিম বাহিনীর সদস্যগণ জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তা ফেরৎ দেব।'

কুরাইশরা শুনেছিল তাদের মালামালসহ আবুল আস মদীনায় মুসলমানদের হাতে ধরা পড়েছে। তারা জানতো তাদের মালামাল ফেরৎ পাবার আর কোন আশা নেই। কিন্তু আবুল আস যখন তাদের সমস্ত মালামাল নিয়ে মক্কায় উপস্থিত হলো তখন তারা হতবাক হয়ে গেল। আবুল আস মালামাল ফেরৎ দিয়ে জানতে চাইলো, 'তোমরা তোমাদের সবার জিনিষ বুঝে পেয়েছো?'

কুরাইশরা তাকে বললো, 'আমরা আমাদের সমস্ত সম্পদ বুঝে পেয়েছি। আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তুমি আমাদের সাথে একজন প্রকৃত মহৎ এবং চরিত্রবান মানুষের মতই ব্যবহার করেছো।'

আবুল আস বললেন, 'আমি যদি তোমাদের মালামাল তোমাদের কাছে পৌছানোর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করতাম তাহলে তোমরা ভাবতে আমি তোমাদের সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন আমি তোমাদের কাছে তোমাদের আমানত পৌছে দিয়েছি। আর শোন, আমি ঘোষনা করছি, আমি আজ থেকে ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে গেলাম।' এ কথা মক্কার কুরাইশদেরকে জানিয়ে হযরত আবুল আস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মদীনায় চলে এলেন।

# নবী করীম (সাঃ) ও গুপ্তঘাতক

বদর যুদ্ধের পরে মক্কার কুরাইশদের মধ্যে একদিকে শোক অপরদিকে প্রতিহিংসার আগুন দাও দাও করে জ্বলে উঠলো। মক্কার ঘরে ঘরে ছিল শোকের মাতম। মক্কার অনু পরমানু পর্যন্ত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রতীজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল। ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করেই তারা ক্ষান্ত হবে। পরবর্তী কালের যুদ্ধসমূহ তাদের ঐ প্রতীজ্ঞার কারণেই সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধ আরেকটি যুদ্ধের জন্ম দেয়। মক্কার কুরাইশরা প্রথম থেকেই যুদ্ধ অবস্থার জন্ম দিয়েছিল। ফলে সংঘটিত হলো রক্তক্ষয়ী বদরের যুদ্ধ। এই বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ঢাকতে গিয়ে তারা বারবার যুদ্ধের জন্ম দিল আর পরাজয়ের তালিকা বৃদ্ধিই করে চললো।

তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, কোন উপলক্ষে মদীনায় গিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে হবে। ইসলামের কঠোর শত্রু ওমাইর ইবনে ওহাব এবং সুফিয়ান ইবনে উমাইয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সুফিয়ান বলছিল, 'এখন আর আমার বেঁচে থেকে কি লাভ হবে!' ওমায়ের তাকে জানালো, 'যদি আমি ঋণগ্রস্থ না হতাম এবং সন্তান-সন্ততির কোন দায়িত্ব আমার ওপর না থাকতো, তাহলে আমি মদীনায় গিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতাম। কারণ সেখানে আমার এক সন্তান বন্দী আছে।'

আবু সুফিয়ান তাকে আশ্বাস দিয়ে বললো, 'তুমি তোমার ঋণ এবং সন্তানদের জন্য কিছুই চিন্তা করো না। তাদের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। তুমি মদীনায় গিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করে এসো।'

তারপর ওমায়ের তার বাড়িতে গিয়ে একটি তীক্ষ্ণধার তরবারী নিয়ে তরবারীতে বিষ মাখালো। তারপর সে মদীনার পথে যাত্রা করলো। মহান আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে তার নবীকে পূর্বেই সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দিলেন। ওমায়ের মদীনায় আসার পরেই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে দেখে সন্দেহ করলেন, লোকটি কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মদীনায় আগমন করেছে। তিনি তাকে ধরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির করলেন। আল্লাহর নবী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ওমায়ের! তুমি কি উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করেছো?'

ওমায়ের জবাব দিল, 'আমি আমার সন্তানকে মুক্ত করার জন্য এসেছি।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে সাথে তরবারী এনেছো কেন?' ওমায়ের জবাব দিল, 'তরবারী বদরের প্রান্তরেও তো কোন কাজে আসেনি।'

আল্লাহর নবী তাকে বললেন, 'কেন আসেনি, তুমি আর আবু সুফিয়ান হাজর নামক স্থানে বসে আমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করোনি?' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় ওমায়েরের বুকের ভেতর কেঁপে উঠলো। সেখানে তারা মাত্র দু'জন এই পরিকল্পনা করেছিল। মদীনায় অবস্থানরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো সে কথা জানার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে তিনি এ কথা জানলেন কেমন করে! মুহূর্তে ওমায়েরের ভেতরের জগৎ আলোকিত হয়ে সমস্ত অন্ধকার দূরিভুত হলো। নবীর সামনে সে আত্মসমর্পণ করে বললো, 'এই পরিকল্পনার কথা আমি আর আবু সুফিয়ান ব্যতীত আর কেউ জানে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি সত্যই আল্লাহর রাসূল।'

মক্কার কুরাইশদের দুর্ভাগ্য, তারা অপেক্ষায় ছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হয়েছে ওমায়েরের হাতে, এই সংবাদ তারা শুনবে। এখন তাদের শুনতে হলো, যে ওমায়ের গিয়েছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে, সে ওমায়ের স্বয়ং নিহত হয়ে নতুন রূপে জন্মগ্রহণ করেছে। সে আর অমুসলিম নেই, এখন তার পরিচয় সে আল্লাহর নবীর গর্বিত উম্মত-মুসলমান।

বীরদর্পে হযরত ওমায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষনা করলেন। মক্কার অলি গলিতে তিনি তাওহীদের বাণী ঘোষনা করতে লাগলেন। তাঁর আহ্বানে প্রতিদিন মক্কায় মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকলো। মক্কার কুরাইশরা ইসলামের বিরুদ্ধে যতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে তাদের সমস্ত পদক্ষেপ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু মক্কাতেই নয়, গোটা পৃথিবীতেই যেখানে ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে অগ্রসর হয়েছে, সেখানেই তারা লাঞ্ছনামূলক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে।

## ওহুদ যুদ্ধের পূর্ব অবস্থা

সীরাতে ইবনে হিশাম থেকে জানা যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহূদ যুদ্ধের পূর্বে হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে আরেকটি অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন, যে অভিযানের নাম হলো 'কারাদ' অভিযান। কারণ, তিনি জানতে পেরেছিলেন, মক্কার কুরাইশরা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করছে, তারা অচিরেই মদীনার ওপর আক্রমন করবে। সুতরাং শত্রুকে সামনে অগ্রসর হতে দেয়া বা তাদেরকে শক্তি সঞ্চয় করতে দেয়া ঠিক নয় বিবেচনা করেই তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। বনী কুরাইজা মদীনায় না থাকেলও মদীনায় ইসলামের শত্রুর অভাব ছিল না।

একদিকে ছিল মুনাফিকের দল, আরেকদিকে ছিল ইয়াহূদী ও পৌত্তলিক সম্প্রদায়। কুরাইশরা তাদের ওপর নির্ভর করেই ইসলামকে উৎখাত করার পরিকল্পনা করছিল। মদীনার কাছের কিছু গোত্র হচ্ছে যেতো, আর এই সুযোগে কুরাইশরা তাদেরকে ইসলামের সাথে বিরোধিতা করার জন্য একপ্রকার বাধ্যই করতো। ইতোপূর্বে কুরাইশরা সিরিয়া থেকে তাদের ব্যবসার মালামাল মদীনার যে পথ দিয়ে নিয়ে আসতো, তখন তারা সে পথ পরিহার করে ভিন্ন আরেক পথ ব্যবহার করা শুরু করেছিল।

ইরাক যাওয়ার পথ দিয়ে কুরাইশরা তখন তাদের ব্যবসার পণ্য নিয়ে আসতো। কারাদ ছিল নজদের একটি জলাশয়। সেখান দিয়েই কুরাইশরা আসা যাওয়া করতো। মক্কা থেকে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে একটি দল প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য নিয়ে সিরিয়ার দিকে যাচ্ছিল। মজুরীর বিনিময়ে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করছিল বনী বকর গোত্রের ফুরাত ইবনে হাইয়ান। হযরত যায়িদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বাহিনী দেখে তারা তাদের মালামাল ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল। হযরত যায়িদ সমস্ত মালামাল এনে আল্লাহর নবীর কাছে জমা দিয়েছিলেন।

উল্লেখিত ঘটনার পরেই ওহূদের প্রান্তরে মক্কার ইসলাম বিরোধিদের সাথে মুসলমানদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটেছিল। মদীনা শহরের উত্তর দিকে প্রায় দুই মাইল দুরে একটি পর্বত শ্রেণীর নাম হলো ওহূদ। অনেক গবেষকগণই মন্তব্য করেছেন, বদরের প্রান্তরে মুসলমানদের উদারতা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অধিক। তাদের এই উদারতার মাশুল তাদেরকে দিতে হয়েছিল ওহূদের প্রান্তরে।

বদরের প্রান্তরে মক্কা থেকে যারা যুদ্ধ করতে এসেছিল, ইসলামের এই শত্রুদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া তেমন কোন কঠিন বিষয় ছিল না। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক রক্তপাত পছন্দ করেননি বলেই তাদের অধিকাংশই প্রাণ নিয়ে মক্কায় পালিয়ে গিয়েছিল। বদরের যুদ্ধের পূর্বে আবু সুফিয়ান সিরিয়া থেকে যে বাণিজ্য বহর মক্কায় এনেছিল এবং যে অর্থ লাভ হয়েছিল, আবু সুফিয়ানের কাছেই তা রক্ষিত ছিল।

বদরের প্রান্তরে যাদের স্বামী, সন্তান, ভাই, পিতা তথা আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়েছিল, তাদের ভেতরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল। তাদের একজন নিহত হলেই তাদের ভেতরে যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত, সেখানে তাদের বিখ্যাত নেতৃবৃন্দসহ ৭০ জন নিহত হয়েছিল। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা হিংস্র হায়েনার মতই হয়েছিল।

আবু জাহিলের সন্তান ইকরামা এবং আরো বেশ কয়েকজন কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে বললো, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের

বহুলোকজন হত্যা করেছে। আমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। ব্যবসার লাভের যে অর্থ জমা আছে, আমরা চাই সে অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণের কাজে ব্যয় করা হোক।' ইকরামার কথায় প্রতি কুরাইশদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সমর্থন জানালো।

বদরের প্রান্তরে তারা মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে অনুমান করেছিল। এ কারণে তারা এবার বদরের তুলনায় অনেক বেশী শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। সে সময় মানুষের মধ্যে যুদ্ধের উদ্দীপনা সৃষ্টি করার জন্য প্রধান হাতিয়ার ছিল উৎসাহ ব্যঞ্জক কবিতা। বদর যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছিল, তাদের ওপরে মক্কার কবিগণ শোকগাঁথা রচনা করে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে শোকগাঁথা গেয়ে সাধারণ মানুষের মনে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিল।

প্রতিপক্ষের আক্রমনের মুখে বদরের ময়দানের মত কোন ব্যক্তি যেন পালিয়ে না আসে, এ কারণে এবার তারা মক্কার কিছু সংখ্যক নারীকে সাথে নিয়েছিল। নারী কোন পুরুষকে লজ্জা দিবে, আরবের লোকদের কাছে এটা ছিল মৃত্যুর শামিল। যুদ্ধের ময়দানে নারী থাকবে আর কোন পুরুষ যোদ্ধা পিছনে সরে আসবে, এ কথা তারা কল্পনাও করতে পারতো না। তাছাড়া নারীরা নানা ধরণের উদ্দীপনামূলক গান গেয়ে সৈন্যদেরকে উৎসাহ দিতো।

যুদ্ধের ময়দানে নারী সাথে থাকলে আরবের লোকজন নিজের সর্বশেষ শক্তি ব্যয় করে যুদ্ধ করতো। তারা জানতো, যুদ্ধে তারা পরাজিত হলে তাদের নারীদের ওপরে প্রতিপক্ষ নির্যাতন করবে। এ কারণে ওহূদের দিকে অগ্রসর হবার সময় তারা ঐ সমস্ত নারীদেরকে সাথে নিয়েছিল, বদরের প্রান্তরে যাদের কেউ না কেউ নিহত হয়েছিল।

বদর যুদ্ধের সেনাপতি ওৎবা নিহত হয়েছিল। তার মেয়ে হিন্দা প্রতীজ্ঞা করেছিল, তার পিতার হত্যাকারীর কলিজা সে চিবিয়ে টুকরো টুকরো করবে। এই হিন্দা ছিল আবু সুফিয়ানের স্ত্রী, কারবালায় নবী বংশ নিধনের নায়ক ইয়াজিদের দাদী এবং হযরত মাবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মাতা। যদিও আবু সুফিয়ান এবং হিন্দা এক সময় ইসলাম কবুল করে ইসলামের যথেষ্ট খেদমত করেছিলেন। আবু জাহিলের সন্তান ইকরামাও এক সময় ইসলাম কবুল করে ইসলামের জন্য শাহাদাতবরণ করেছিলেন।

এ ধরণের বেশ কয়েকজন নারী, ওহূদের ময়দানে কুরাইশদের সাথে ছিল। তাদের নাম হলো, হিন্দা, আবু জাহিলের সন্তান ইকরামার স্ত্রী উম্মে হাকিম, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের বোন ফাতিমা, তায়েফের নেতা মাসুদ সাকাফির মেয়ে বারজাহ, আমর ইবনুল আসের স্ত্রী রীতা বা বারিতা, হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা

আনহুর মাতা গান্নাস। এই ওহুদের ময়দানেই কাফির মাতার চোখের সামনেই হযরত মুসআব শাহাদাত বরণ করেছিলেন। মক্কা থেকে কুরাইশরা যাত্রা করে মদীনার সামনের উপত্যকার মুখে ঝর্ণার কাছে ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। আল্লাহর নবী কুরাইশদের প্রস্তুতির কথা জেনে সাহাবায়ে কেরামের কাছে বললেন, 'আমি একটি ভালো স্বপ্ন দেখেছি। আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার একটি গরু জবেহ করা হয়েছে। আমার তরবারী একদিকে ফেটে গেছে। আমি একটি সুরক্ষিত বর্মের ভেতরে হাত প্রবেশ করিয়েছি।

তাঁর এই স্বপ্নের তাৎপর্য ছিল, এবার তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সাহাবা শাহাদাতবরণ করবে। রাসূলের পরিবার ভুক্ত একজন অর্থাৎ হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শাহাদাতবরণ করবেন। তাঁর দেখা স্বপ্নের একটি অংশের উল্লেখ করে সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, 'আমি বর্ম দ্বারা মদীনাকে বুঝেছি। তোমরা যদি ভালো মনে করো তাহলে মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থান করেই কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করবে তাহলে তা করতে পারো। এরপরও যদি কুরাইশরা ওখানেই অবস্থান করে তাহলে তাদের পরিণতি খারাপ হবে। আর তারা যদি মদীনায় প্রবেশ করে তাহলে আমরা মদীনায় বসেই তাদের মোকাবেলা করবো।'

বিশ্বনবীর চাচা হযরত আব্বাস ইসলাম কবুল করলেও তিনি মক্কাতেই বসবাস করতেন। তিনি কুরাইশদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য লিখে একজন সংবাদদাতা প্রেরণ করেছিলেন মদীনায়। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সংবাদদাতাকে সতর্ক করে দিলেন, সে যেন তিনদিনের মধ্যে মদীনায় আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়ে মক্কার সংবাদ জানায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে তিনিও দু'জন সংবাদ সংগ্রহকারীকে কুরাইশদের গতিবিধি জানার জন্য প্রেরণ করলেন।

তাঁরা ফিরে এসে জানালো, কুরাইশ বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেছে। তাদের অশ্ব মদীনার চারণ ক্ষেতগুলো খেয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে। আল্লাহর নবী একজনকে প্রেরণ করলেন, কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা জানার জন্য। তিনি সংবাদ সংগ্রহ করে তাঁকে জানালেন। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার চারদিকে এমনভাবে প্রহরার ব্যবস্থা করলেন যে, বাইরের কোন শক্তি যেন মদীনা আক্রমন করতে না পারে। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রহরা দেয়ার জন্য নিযুক্ত হলেন হযরত সায়াদ ইবনে মুয়াজ ও হযরত সায়াদ ইবনে ওবাদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম। তাঁরা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মসজিদে নববীর দরজায় প্রহরা দিতে থাকলেন।

আল্লাহর নবী সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে গুরত্বপূর্ণ বৈঠকে বসলেন। তিনি তাদের মতামত জানতে চাইলেন, মদীনার ভেতরে অবস্থান করেই যুদ্ধ করা হবে, না মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করা হবে। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডাকা হয়নি, তবুও সে বৈঠকে উপস্থিত থেকে উপযাচক হয়ে মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থান করে শত্রুর সাথে মোকাবেলার পরামর্শ দিল। মুনাফিক নেতা বলেছিল, 'মদীনাতেই অবস্থান গ্রহণ করুন, বাইরে যাবেন না। আমরা মদীনার বাইরে গিয়ে তাদের মোকাবেলা করতে গেলে শত্রু আমাদের অধিক ক্ষতি করতে পারবে। আর আমরা মদীনার ভেতরে বসে তাদের সাথে মোকাবেলা করলে আমরা তাদের অধিক ক্ষতি করতে পারবো। সুতরাং আপনি বাইরে যাবেন না। শত্রুরা যেখানে আছে তাদের সেখানেই থাকতে দিন। তাদের অবস্থান স্থল তাদের জন্য অবরোধ স্থল হিসাবেই গণ্য হবে। তারা যদি মদীনায় প্রবেশ করে তাহলে আমাদের যোদ্ধাগণ তাদেরকে উপযুক্ত জবাব দেবে আর আমাদের নারী আর শিশুরা বাড়ির ছাদের ওপর থেকে শত্রুদের ওপরে পাথর দিয়ে আঘাত করতে পারবে।'

মুনাফিক নেতার অভিলাষ ছিল, তার পরামর্শ মত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি মদীনার অভ্যন্তরে থেকেই যুদ্ধ করেন, তাহলে সে তার ইয়াহূদী মিত্রের সাথে যোগ দিয়ে ভেতর থেকে মুসলমানদেরকে আঘাত করে মদীনা থেকে ইসলামকে বিদায় করে দেবে। আল্লাহর নবী মুনাফিক নেতার এই গোপন অভিলাষের কথা জানতে পেরে এবং সামরিক কৌশলের কারণে মদীনার বাইরে গিয়েই যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

সাহাবায়ে কেরামের একটি অংশও মদীনার ভেতরে অবস্থান করে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন। বদরের যুদ্ধে যেসব সাহাবা অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তাঁরা পরামর্শ দিলেন মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য। তাঁরা বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! শত্রুর মোকাবেলার জন্য আমাদেরকে মদীনার বাইরে নিয়ে চলুন, কেননা ওরা যেন ধারণা করতে না পারে যে, আমরা কাপুরুষ হয়ে গেছি বা দুর্বল হয়ে পড়েছি।'

সেদিন ছিল জুমুআবার। একজন আনসার সাহাবীও সেদিন ইন্তেকাল করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামায আদায় করে তারপর জানাযা আদায় করলেন। এরপর তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করে যুদ্ধের পোষাকে সজ্জিত হয়ে যখন বের হয়ে এলেন, তখন যেসব সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁরা ধারণা করেছিল, আল্লাহর নবীর ইচ্ছা ছিল মদীনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করা, এখন তাদের পরামর্শেই তিনি বাইরে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন।

সাহাবায়ে কেরাম বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করছি। আপনি বাইরে না গিয়ে মদীনাতেই অবস্থান করুন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এটা কখনো হয় না। যুদ্ধের পোষাক পরিধানের পরে তা খুলে ফেলা কোন নবীর পক্ষে শোভনীয় নয়।'

মক্কা থেকে ইসলামের শত্রু বাহিনী যাত্রা করে মদীনার উপকণ্ঠে পৌছেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামায আদায় করে যুদ্ধে যাত্রা করলেন। মুসলিম বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল এক হাজার। এর ভেতরে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের অনুগত সৈন্য ছিল তিনশত।

আল্লাহর নবী শাওত নামক স্থানে পৌছার পরে বিশ্বাসঘাতক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার অনুগত তিনশত সৈন্য নিয়ে পৃথক হয়ে গেল। সে সৈন্য বাহিনীকে লক্ষ্য করে ঘোষনা দিল, 'ওহে লোক সকল! আমি বুঝতে পারছি না তোমরা কেন এতগুলো মানুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় প্রাণ দিবে।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মুনাফিক নেতাকে অনুরোধ করে বললো, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি, তোমার মুসলিম ভাইদেরকে এবং স্বয়ং আল্লাহর নবীকে শত্রুর অস্ত্রের সামনে ফেলে এভাবে চলে যেও না।' বিশ্বাসঘাতক জবাব দিল, 'আমাদের ধারণা যুদ্ধ হবে না। যুদ্ধ হবে মনে করলে আমরা ফিরে যেতাম না।'

তাদেরকে অনেক অনুরোধ করেও ফিরিয়ে আনা গেল না। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রেগে উঠে বললেন, 'হে আল্লাহর শত্রুরা! আল্লাহ তোদেরকে বিতাড়িত করে দিক। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোদের মুখাপেক্ষী নয়, আমাদের জন্য মহান আল্লাহই যথেষ্ট।'

মাত্র সাত শত সৈন্য নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহূদের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। মুসলিম বাহিনীর ভেতরে একশতজন ছিল লৌহ বর্ম আবৃত। এই বাহিনীতে বেশ কয়েকজন কিশোর সাহাবী ছিলেন। আল্লাহর নবী তাঁদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এতই প্রবল ছিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরে তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন।

হযরত ছামুরা এবং হযরত রাফে রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম ছিলেন বয়সে একেবারেই কিশোর। সেনা বাহিনী যখন বাছাই করা হচ্ছিল, তখন তাঁরা পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলেন, যেন তাদেরকে বড় দেখা যায়। তাদেরকে বাদ দেয়া হলে তাঁরা আল্লাহর পথে প্রাণ দান করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো, এ কথা

মনে করে কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তাদের কাঁন্না দেখে স্থির করা হলো, এই দুইজনের মধ্যে কুস্তি লড়ে যে জিতবে তাকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেয়া হবে। দু'জন বোধহয় এই সুযোগ লাভ করে একে অপরের কানে কানে বলে দিয়েছিল, 'কুস্তি লড়াইতে একবার তুমি হারবে আরেক বার আমি হারবো। তাহলে আমরা দু'জনই যুদ্ধে যোগ দেয়ার সুযোগ লাভ করবো।'

পরিশেষে তারা কুস্তি লড়াই করে বিজয়ী হয়ে রাসূলের অনুমতি লাভ করেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুসারীদেরকে এমন শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে, তাঁরা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রাণ দান করার জন্য প্রতিযোগিতা করতো। আর তাদের এই ত্যাগের কারণেই ইসলাম একটি অপরাজিত শক্তি হিসাবে বিশ্বব্যাপী আত্মপ্রকাশ করেছিল।

## শাহাদাতে দান্দান মোবারক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুগত বাহিনীকে ওহুদ পাহাড়ের সামনের অঙ্গনে একত্রিত করে বুহ্য রচনা করলেন। আনসারদের মধ্য থেকে পরামর্শ দেয়া হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মিত্র ইয়াহূদীদেরকে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে বললে হয় না?'

আনসারদের এই পরামর্শ দেয়ার কারণ হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, তার মধ্যে একটি ধারা ছিল, কোন বাইরের শক্তি দ্বারা যদি মদীনা আক্রান্ত হয়, তাহলে সবাই সম্মিলিতভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। চুক্তির এই ধারার কথা স্মরণ করেই আনসারদের পক্ষ থেকে ঐ পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর নবী তাঁদের পরামর্শের উত্তরে বলেছিলেন, 'ইয়াহূদীদের দিয়ে আমাদের কোন কাজ নেই।'

'আল কোরআনের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে ইয়াহূদীদের সহযোগিতায় এ অভিপ্রায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কখনো ছিল না।' চুক্তি অনুযায়ী ইয়াহূদীরা সাহায্য করতে বাধ্য ছিল। কিন্তু তিনি তাদের সাহায্য গ্রহণ করেননি। কারণ তিনি জানতেন, তিনি যদি আজ ইয়াহূদীদের সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত এটা একটি কালো দলিল হয়ে থাকবে মুসলমানদের জন্য। তাছাড়া বিষধর সাপকে বিশ্বাস করা গেলেও ষড়যন্ত্রকারী ইয়াহূদীদের বিশ্বাস করা যায় না। তারা মুসলিম বাহিনীর ভেতরে অবস্থান করে ইসলামের শত্রুদেরকে সহযোগিতা বা মুসলিম বাহিনীকে হত্যা করতো না, এমন নিশ্চয়তা তো ছিল না।

মুসলিম সৈন্যদেরকে তিনি আদেশ দিলেন, 'আমি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করবে না।'

মদীনার আনসাররা নিজের চোখে দেখছিল, তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আবাদ করা ক্ষেতগুলো মক্কার কুরাইশরা পশুপাল দিয়ে খাওয়াচ্ছে। এই দৃশ্য তাদের কাছে ছিল অসহনীয়। কিন্তু সিপাহসালারের অনুমতি না থাকার কারণে তাঁরা কিছুই বলতে পারছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে ৫০ জনের তীরান্দাজ বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তাঁকে চিহ্নিত করার জন্য তাঁর মাথায় সাদা কাপড় দেয়া হয়েছিল।

তাঁকে নির্দেশ দিলেন, 'শত্রু পক্ষের অশ্বারোহী বাহিনীকে তুমি তীর দিয়ে প্রতিরোধ করবে। যুদ্ধে আমরা জয়ী হই বা পরাজিত হই, কোন অবস্থাতেই তোমার পেছন থেকে কেউ যেন আক্রমন করতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখবে। তুমি তোমার নিজের স্থানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করবে, কোনক্রমেই তোমাদের পেছন থেকে কেউ যেন আক্রমন করতে না পারে।'

হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হলো। যাদের দেহে বর্ম ছিল না, এদের নেতৃত্ব দেয়া হলো হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ওপর। এরপর আল্লাহর নবী স্বয়ং দুটো বর্ম পরিধান করলেন। যুদ্ধের পতাকা উঠিয়ে দিলেন তরুণ সাহাবী হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর হাতে। এই সাহাবীর গর্ভধারিণী মাতা তখন কুরাইশদের সাথে ওহুদের ময়দানেই মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এসেছে।

বদর যুদ্ধে কুরাইশদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এই ওহুদের প্রান্তরে তারা সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগালো। তারাও মুসলিম বাহিনীর মতই সৈন্যদের বুহ্য রচনা করেছিল। বদরের তুলনায় এবার তাদের প্রস্তুতি ছিল কয়েকগুণ বেশী। তাদের সৈন্যদের মধ্যে এবার শৃংখলাও ছিল লক্ষনীয়। বাহিনীর কিছু অংশের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছিল খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে, আর কিছু অংশের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছিল আবু জাহিলের সন্তান ইকরামাকে। তীরান্দাজ বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয়েছিল আব্দুল্লাহ ইবনে রাবিয়াকে। অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব ছিল স্বয়ং আবু সুফিয়ানের হাতে। পতাকা দেয়া হয়েছিল তালহার হাতে।

দুইশত ঘোড়া প্রস্তুত রাখা হয়েছিল, যেন জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রথমে তারা যুদ্ধের কোন বাজনা না বাজিয়ে তাদের নারীর দলকে সামনের দিকে এগিয়ে দিলো। কুরাইশদের এই হিংস্র নারীরা নানা ধরণের উস্কানীমূলক কবিতা আবৃত্তি করতে করতে দফ্ বাজিয়ে কুরাইশ বাহিনীর সামনে দিয়ে ঘুরে গেল।

## কে এই তরবারীর হক আদায় করবে?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের তরবারী হাতে নিয়ে ঘোষনা করলেন, 'আমার এই তরবারীর হক আদায় করার জন্য কে প্রস্তুত আছো?'

মুসলিম বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারী গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তরবারীর দিকে অসংখ্য হাত এগিয়ে এলো। আল্লাহর নবী সে তরবারী কাউকে দিলেন না। হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তরবারীর হক আদায় করা বলতে কি বুঝায়?' তিনি বললেন, 'তরবারীর হক আদায় বলতে এই তরবারী দিয়ে শত্রুকে এত বেশী আঘাত করতে হবে, যেন এই তরবারীই বাঁকা হয়ে যায়।'

হযরত আবু দুজানা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি ঐ তরবারী গ্রহণ করবো এবং তরবারীর হক আদায় করবো।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তরবারী হযরত আবু দুজানার হাতে দিলেন। তিনি তরবারী গ্রহণ করে গর্বিত ভঙ্গিতে হেঁটে সৈন্যদের বুহ্যে চলে গেলেন। আল্লাহর নবী তাঁর সাহাবীর হাঁটার ভঙ্গী দেখে মন্তব্য করলেন, 'যুদ্ধের ময়দান ব্যতীত হাঁটার এই ভঙ্গী আল্লাহর কাছে চরম অপছন্দনীয়।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম বাহিনীকে পরস্পরের পরিচিতির জন্য একটি সংকেত শিখিয়ে দিয়েছিলেন। বাহিনীর কোন সদস্য যদি 'আমিত' শব্দ বলে তাহলে বুঝতে হবে সে নিজেদের লোক। 'আমিত' শব্দের অর্থ হলো, মরণ আঘাত হানো।

যুদ্ধের প্রথমেই কুরাইশদের পক্ষ থেকে এমন একজন লোক ময়দানে এলো, যে লোকটি ছিল এক সময় মদীনার অধিবাসী। মদীনার আনসারদেরকে লোকটি প্রচুর দান করতো। লোকটির নাম ছিল আবু আমের। সে ধারণা করেছিল, কুরাইশদের সাথে তাকে দেখলেই মদীনার আনসাররা আল্লাহর নবীকে ত্যাগ করে তার সম্মানে ও তার অতীত দানশীলতার কথা স্মরণ করে কুরাইশদের সাথে যোগ দেবে।

মূর্খ এই লোকটি ময়দানে এসেই হুংকার ছাড়লো, 'আমাকে তোমরা চিনতে পারছো? আমি আবু আমের।'

আনসাররা জবাব দিল,'আমরা তোমাকে চিনি। তুমি যা আশা করছো তা আল্লাহ পূরণ করবেন না।'

কুরাইশদের পতাকাধারী দল থেকে তালহা বের হয়ে এসে চিৎকার করে বললো, 'ওহে মুসলমানের দল! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আমাকে জাহান্নামে প্রেরণ করতে চায় অথবা নিজেই সে জান্নাতে যেতে চায়?'

লোকটির বিদ্রুপাত্মক কথা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সহ্য করতে পারলেন না। তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'তোকে জাহান্নামে প্রেরণের জন্য আমি আছি।'

এ কথা বলে তিনি এমন শক্তিতে তালহাকে (মুসলিম বাহিনীর তালহা ভিন্ন ব্যক্তি) আঘাত করলেন, এক আঘাতেই সে কাফির ধূলি শয্যা গ্রহণ করলো এবং হাতের পতাকা লুটিয়ে পড়লো। তালহার ভাই ওসমান ময়দানে আপন ভাইয়ের শোচনীয় অবস্থা দেখে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে এলো।

হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এমনভাবে তার কাঁধে আঘাত করলেন যে, ওসমানের কোমর পর্যন্ত হযরত হামজার তরবারী পৌঁছে গেল। এরপরেই ব্যাপক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রাসূলের তরবারী নিয়ে কুরাইশদের বুহ্য ভেদ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। হযরত আলী ও হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম একইভাবে কুরাইশদের সৈন্য বাহিনীর বুহ্য ভেঙ্গে তছনছ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত হামজা দুই হাতে তরবারী চালনা করছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসূলের তরবারীর অধিকারী আবু দুজানা এমনভাবে যুদ্ধ করছিলেন যে, তাঁর তরবারীর সামনে যে পড়ছিল সেই নিহত হচ্ছিল। আমি দেখলাম শত্রুদের একটি লোক আমাদের লোকদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করছিল। আবু দুজানা ঐ লোকটির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি দোয়া করছিলাম লোকটি যেন আবু দুজানার সামনে পড়ে। এক সময় সে আবু দুজানার সামনে পড়লো।

দু'জনে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। লোকটি আবু দুজানাকে প্রচন্ড বেগে তরবারীর আঘাত হানলো। আবু দুজানা সে আঘাত তাঁর চামড়ার ঢাল দিয়ে প্রতিহত করলেন এবং লোকটির তরবারী আবু দুজানার চামড়ার ঢালে আটকে গেল। এই সুযোগে তিনি রাসূলের দেয়া তরবারী দিয়ে আঘাত করে লোকটিকে হত্যা করলেন।

## রাসূলের তরবারীর সম্মান

এরপর তাঁর সামনে পড়লো আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা। আবু দুজানা তাঁর মাথার ওপর তরবারী উঠিয়েও নামিয়ে নিলেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'আমি দেখলাম কে একজন মক্কার কাফিরদেরকে উস্কানী দিচ্ছে। আমি তার এই অপকর্ম বন্ধ করার জন্য এগিয়ে গেলাম। আমি তরবারী উঠাতেই সে ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। তখন আমি বুঝলাম সে একজন নারী। আমি রাসূলের তরবারী দিয়ে একজন নারীকে আঘাত করে তরবারীর অপমান করতে চাইনি। এ কারণে আমি আঘাত করিনি।'

মুসলিম বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমনের মুখে মক্কার কুরাইশরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। যখনই তারা পিছনের দিকে সরে যেতে থাকে, তখনই তাদের নারীরা কবিতা আবৃত্তি করে তাদের উৎসাহ সৃষ্টি করছিল। হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর আক্রমনের মুখে কুরাইশ বাহিনী বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে পড়ছিল। তিনি দু'হাতে তরবারী চালনা করে শত্রু নিধন করছিলেন।

হাবশী গোলাম ওয়াহশী তাঁর মনিবের সাথে চুক্তি করেছিল, সে যদি হযরত হামজাকে হত্যা করতে পারে তাহলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে। সে লক্ষ্য স্থির করে আড়ালে বসেছিল। হারবা নামক ছোট এক ধরণের বর্শা দূর থেকে ছুড়ে সে হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে হত্যা করেছিল। হযরত হানজালার পিতা আবু আমের কুরাইশদের পক্ষে যুদ্ধ করছিল। হযরত হানজালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলেন, তিনি তাঁর পিতার সাথে যুদ্ধ করবেন।

আল্লাহর নবী এটা পছন্দ করলেন না যে, পিতার সাথে সন্তান যুদ্ধ করবে। তিনি অনুমতি দিলেন না। মুসলিম বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমনের মুখে যুদ্ধের এক পর্যায়ে মক্কার কুরাইশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। মুসলিম বাহিনী কুরাইশদের ফেলে যাওয়া সম্পদ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছে দেখে তীরান্দাজ বাহিনীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। একদল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য ময়দানে চলে যাবার পক্ষে মতামত দিল।

তীরান্দাজ বাহিনীর সেনাপতি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাদেরকে বারবার নিষেধ করার পরেও তাঁরা নেতার আদেশ অমান্য করে গণিমতের মালামাল সংগ্রহ করার জন্য ময়দানে ছুটে গেল। মক্কার কুরাইশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। আল্লাহর নবী মুসলমানদের তীরান্দাজ বাহিনীকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত অবস্থান করতে আদেশ দিয়েছিলেন, সে স্থান অরক্ষিত দেখে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ তার বাহিনী নিয়ে সেদিক থেকেই ঝড়ের বেগে আক্রমন করেছিলেন।

নেতার আদেশ অমান্য করার ফল হাতে হাতেই মুসলিম বাহিনী লাভ করলো। চারদিক থেকে কুরাইশ বাহিনী একত্রিত হয়ে অপ্রস্তুত মুসলিম বাহিনীকে এমনভাবে আক্রমন করলো যে, তাঁরা যুদ্ধ করা দূরে থাক– আত্মরক্ষা করার মত সুযোগ পেল না। অসহায়ের মত বড়বড় বীর যোদ্ধা শাহাদাতবরণ করতে লাগলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ়ের মতই অনেকে কি করবেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। তীরান্দাজ বাহিনীর যে কয়জন গিরিপথে প্রহরা দিচ্ছিলেন, তাঁরা একে একে শাহাদাতবরণ

করলেন। কুরাইশ বাহিনীর লক্ষ্য ছিল একটিই, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করা। ইসলাম বিরোধিদের আক্রমন এতই তীব্র ছিল যে, অধিকাংশ সাহাবা সে সময় জানতেন না, আল্লাহর রাসূলের কোথায় কি অবস্থায় আছেন।

কুরাইশ বাহিনী আর মুসলিম বাহিনী এমনভাবে একাকার হয়ে গিয়েছিল যে, কে শত্রু আর কে মিত্র তা জানার উপায় ছিল না। হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর চেহারা এবং দেহের আকৃতি কিছুটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতই ছিল। তিনি মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহন করছিলেন। কাফির ইবনে কামিয়া তাকে হত্যা করে ভেবেছিল সে আল্লাহর নবীকে হত্যা করেছে। ময়দানে সে চিৎকার করে বলেছিল, মুসলমানদের নবীকে আমি হত্যা করেছি।

তার এই চিৎকার শুনে মুসলিম বাহিনীর শেষ শক্তিটুকুও যেনো ঝরে পড়েছিল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মত ব্যক্তি নিশ্চল হয়ে বসেছিলেন। হযরত আনাসের চাচা হযরত আনাস ইবনে নদর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম হযরত ওমরকে তরবারী ফেলে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'আপনি যুদ্ধ না করে এখানে এমন করে বসে আছেন কেন?' তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'এখন যুদ্ধ করে আর কি হবে, আল্লাহর নবীই তো পৃথিবীতে আর নেই।'

হযরত আনাস ইবনে নদর আর্তচিৎকার করে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল আর নেই! তাহলে আমার আর বেঁচে থেকে কি হবে!'

এ কথা বলেই তিনি ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। এক পর্যায়ে তিনিও শাহাদাতবরণ করলেন। তাঁর অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তাকে চেনার কোন উপায় ছিল না। কারণ কাফিরদের অস্ত্রের আঘাতে আঘাতে তাঁর দেহ অক্ষত ছিল না। তাঁর হাতের আঙ্গুল দেখে তাঁর বোন তাকে সনাক্ত করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ বিশ্বাস করেছিল রাসূল আর নেই আবার কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না, আল্লাহর রাসূলকে কাফিররা হত্যা করতে পারে।

যারা বিশ্বাস করেছিল, তাঁরা জীবিত থাকার আশা ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধ করে শাহাদাতের পথ বেছে নিয়েছিল। আর যারা বিশ্বাস করেনি, তাঁরা যুদ্ধ করছিল এবং আকুল দৃষ্টিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারা খুঁজে ফিরছিল। হযরত কা'ব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেই পবিত্র চেহারা দেখতে পেলেন। অদম্য আবেগে তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'হে নবীর অনুসারীরা! আল্লাহর নবী আমাদের মাঝে আছেন!' তাঁর কণ্ঠ শুনে সাহাবায়ে কেরাম ছুটে গেলেন আল্লাহর নবীর কাছে। কাফির বাহিনীর মূল লক্ষ্যই ছিল আল্লাহর নবীকে হত্যা করা। তারা

যখন জানতে পারলো, নবী এখনো জীবিত আছে, তখন নবীর অবস্থানের দিকেই তারা আক্রমন করলো তাঁকে হত্যা করার জন্য কুরাইশ বাহিনী সর্বশক্তি নিয়োগ করলো।

চারদিক থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘেরাও করে কাফিরের দল আক্রমন করলো। বৃষ্টির মতই অস্ত্র বর্ষিত হচ্ছিল। সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজেদের মাঝে রেখে চারদিকে মানববন্ধন তৈরী করলেন। অস্ত্রের সমস্ত আঘাত এসে তাঁদের ওপরেই নিপতিত হতে থাকলো। তাঁরা তাদের জীবনী শক্তির শেষবিন্দু দিয়ে হলেও আল্লাহর নবীকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। একের পরে আরেকজন শাহাদাতের অমীয় সূধা পান করে জান্নাতের দিকে চলে যাচ্ছিলেন।

হযরত জিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু গুরুতর আহত হয়ে পড়ে গেলেন। তখন পর্যন্ত তাঁর দেহে প্রাণশক্তি অবশিষ্ট ছিল। আল্লাহর নবীর আদেশে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে ধরাধরি করে রাসূলের কাছে এনে শুইয়ে দিলেন। হযরত জিয়াদ আল্লাহর হাবিবের পবিত্র কদম মোবারকে মুখ রেখে শাহাদাতবরণ করলেন। এই চরম দুর্যোগের মুখেও এক তরুণ সাহাবী খেজুর খাচ্ছিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি এই মুহূর্তে আপনার জন্য প্রাণ দান করি তাহলে আমি কোথায় যাবো?'

আল্লাহর নবী তাঁকে বললেন, 'তুমি প্রাণ দান করলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।' রাসূলের পবিত্র মুখ থেকে এ কথা শোনার সাথে সাথে তিনি তরবারী হাতে ছুটে গেলেন। যুদ্ধ করতে করতে তাওহীদের এই বীর সেনানী শাহাদাতবরণ করলেন। চারদিক থেকেই অস্ত্র ছুটে আসছে। সমস্ত অস্ত্রের আঘাত এসে সাহাবায়ে কেরামের দেহে পড়ছে। সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের দেহকে ঢালের মতই ব্যবহার করছেন। তবুও কলিজার টুকরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অক্ষত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

মক্কার জালিম আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ সাহাবায়ে কেরামের বেষ্টনীর ওপর দিয়ে দোজাহানের বাদশাহকে আঘাত করার জন্য বারবার তরবারীর আঘাত হানছে। হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শূন্য হাতে তীক্ষ্ণধার তরবারীর আঘাত ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এক পর্যায়ে তাঁর একটি হাত কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বেঁচে থাকার আর কোন আশা নেই, ঘাতকরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে আঘাত করছে। আর করুণার সিন্ধু সেই চরম মুহূর্তেও মহান আল্লাহর কাছে ঘাতকদের জন্য বলছেন, 'রাবিগ্‌ফিরলি কাওমি ফাইন্নাহুম লা ইয়া'লামুন–হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা যে কিছুই বুঝে না।'

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তাঁরা আবেদন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মাথা উঁচু করবেন না। তীর এসে বিদ্ধ হতে পারে। যত তীর আসে আসুক, আমাদের বুক আছে। আমাদের বুক দিয়েই আমরা তীর প্রতিরোধ করবো।'

রাসূল যাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করছেন, সেই জালিমের দলই রাসূলকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে এসে আঘাতের পরে আঘাত করছে। জালিম ইবনে কামিয়া তরবারী দিয়ে বিশ্বনবীর পবিত্র চেহারায় আঘাত করলো। তার তরবারীর আঘাতে আল্লাহর নবীর মাথার লোহার শিরস্ত্রাণের দুটো কড়া ভেঙ্গে চেহারা মোবারকে প্রবেশ করলো। আল্লাহর নবী মুসলমানদের নয়নের মণি, কলিজার টুকরা রক্তাক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে বললেন, 'ঐ জাতি কি করে কল্যাণ লাভ করতে পারে, যারা তাদের নবীকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দেয়, অথচ সে নবী তাদেরকে আল্লাহর দিকেই আহ্বান করছে!'

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীর এই সামান্য আক্ষেপটুকুও পছন্দ করলেন না। সাথে সাথে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলো। বলা হলো–

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ –

হে নবী! চূড়ান্তভাবে কোনো কিছুর ফায়সালা করার ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তোমার কোনোই হাত নেই, আল্লাহরই ইখতিয়ারে রয়েছে, ইচ্ছা হলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন, কারণ তারা জালিম। (সূরা ইমরাণ-১২৮)

সীরাতে ইবনে হিশামে উল্লেখ করা হয়েছে, কাফিরদের আঘাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দান্দান মোবারক শাহাদাতবরণ করেছিল। তাঁর চেহারা মোবারকে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। সে ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরছিল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর ঢাল ভর্তি করে পানি আনছিলেন আর হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা প্রিয় পিতার ক্ষত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। রক্ত যখন বন্ধ হলো না, তখন বিছানার একটি অংশ পুড়িয়ে তার ছাই ক্ষতস্থানে দেয়ার পরে রক্ত বন্ধ হয়েছিল।

# হযরত হামজা (রাঃ)-এর শাহাদাত

হক আর বাতিলের প্রথম রক্তক্ষয়ী সংঘাত- বদর যুদ্ধের দিনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর মাথার পাগড়ীর সাথে উট পাখির পালক লাগিয়ে ছিলেন। সেদিনও তিনি দু'হাতে তরবারী চালনা করে বাতিল শক্তির ভেতরে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। মাথায় পাখির পালক থাকার কারণে তিনি যেদিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন, তাঁকে সহজেই চেনা যাচ্ছিলো।

নিহত হবার পূর্বে হযরত বিলালকে নির্যাতনকারী মক্কার কাফির নেতা উমাইয়া হযরত আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মাথায় উট পাখির পালক লাগানো লোকটি কে?'

হযরত আব্দুর রহমান বলেছিলেন, 'তিনি বিশ্বনবীর চাচা হযরত হামজা।' উমাইয়া আক্ষেপ করে বলেছিল, 'ঐ ব্যক্তি আজ আমদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে।'

বদরের ময়দানে মক্কার জুবায়ের ইবনে মুতয়িমের চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর হাতে নিহত হয়েছিল। ওহুদের দিনে সে তার গোলাম ওয়াহশীকে শর্ত দিয়েছিল, 'তুমি যদি হামজাকে হত্যা করে আমার চাচা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারো তাহলো আমি তোমাকে দাসত্বের এই ঘৃণ্য জীবন থেকে মুক্তি দিবো।'

ওয়াহশী ওহুদের প্রান্তরে একটি বিশাল পাথর খন্ডের আড়ালে এমন একটি বর্শা হাতে ওৎপেতে বসেছিল, যে বর্শা দূর থেকে ছুড়ে প্রতিপক্ষকে হত্যা করা যায়। হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দু'হাতে তরবারী পরিচালনা করছেন আর কাফিরদের বুহ্য ভেঙ্গে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। শত্রুপক্ষ তাঁর সুতীক্ষ্ণধার তরবারীর সামনে কাটা কলা গাছের মতই মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল। হযরত হামজা যে মুহূর্তে পাথর খন্ড অতিক্রম করছিলেন, পাথরের আড়ালে ওৎপেতে বসে থাকা ওয়াহশী তার হাতের বর্শা হযরত হামজার নাভি লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলো।

তীক্ষ্ণ বর্শা নবীর প্রিয় চাচার নাভিমূলে বিদ্ধ হয়ে পৃষ্ঠদেশ পার হয়ে গেল। জীবনের এই শেষ মুহূর্তেও ইসলামের এই বীর সেনানী শত্রুকে আঘাত করার জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তাঁর জীবনী শক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না। তিনি রক্তাক্ত দেহে ওহুদের রণপ্রান্তরে লুটিয়ে পড়লেন। মক্কায় আবু জাহিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সামান্য আঘাত করেছিল, চাচা হামজা তা সহ্য করতে না পেরে আবু জেহেলকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওহুদের প্রান্তরে যখন আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ আল্লাহর নবীকে আঘাত করে রক্তাক্ত করেদিল, তখন

হযরত হামজা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে পারলেন না। ওয়াহশীর নিক্ষিপ্ত বর্শার আঘাত তাঁকে চিরদিনের মতই নিথর নিস্তব্দ স্পন্দনহীন করে দিয়েছে। তিনি আর কোনদিন আল্লাহর নবীর সামনে এসে দাঁড়াবেন না।

হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে হত্যা করে ওয়াহশী যুদ্ধ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। সেদিন আর তার পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। দাসের জীবন থেকে সে মুক্তি লাভ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর রাসূলের সামনে এসে দাঁড়াতেই রাসূলের মানসপটে প্রিয় চাচা হামজার শত সহস্র স্মৃতি ভেসে উঠেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদনা বিধুর হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে হযরত ওয়াহশীকে বলেছিলে, 'ওয়াহশী! তুমি আমার সামনে এসো না। তোমাকে দেখলেই আমার চাচার কথা মনে পড়ে।'

হযরত ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রতীজ্ঞা করেছিলেন, হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে হত্যা করে যে পাপ তিনি করেছেন, জীবন দান করে হলেও তিনি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর খেলাফতকালে হযরত ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ভন্ডনবী মুসাইলামাকে হত্যা করে তাঁর সে কৃতকর্মের কাফ্ফারা আদায় করেছিলেন।

কুরাইশদের নারী বাহিনী মুসলিম বাহিনীর শাহাদাত বরণকারীদের নিথর লাশের ওপরে শকুনের মতই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শহীদদের লাশের নাক-কান ও বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে মালা বানিয়ে তাদের গলায় পরেছিল। আল্লাহর নবীর প্রিয় চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর স্পন্দনহীন লাশ নিয়ে মক্কার হিংস্র হায়েনার দল পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছিল। তাঁর পবিত্র নাক-কান ও দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে মালা বানিয়ে তা গলায় পরে নগ্ন উল্লাস প্রকাশ করেছিল।

এতেও তাদের হিংস্র আক্রোশ চরিতার্থ হলো না, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী, আমীরে মুয়াবিয়ার মাতা হিন্দা হযরত হামজার পেট-বুক চিরে ফেললো। রাসূলের চাচার বুকের ভেতর থেকে হিন্দা কলিজা বের করে আনলো। সে কলিজা হিন্দা চিবিয়ে খেয়ে ফেলার চেষ্টা করলো। কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা ছিল ভিন্ন ধরণের। হিন্দা সে কলিজা গিলতে না পেরে বমি করে ফেলে দিল। ইতিহাস মক্কার এই নারীকে 'কলিজা ভক্ষণকারিণী' হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

যুদ্ধ অবসানে শহীদদের লাশ দাফন করা হচ্ছে। শাহাদাতের রক্তাক্ত ময়দানে আল্লাহর নবীর প্রিয় চাচার প্রাণহীন দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর লাশের এ অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কেরাম ফুঁপিয়ে

কেঁদে উঠলেন। আল্লাহর নবী অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'চাচা! তোমার ওপরে আল্লাহ রহম করুন। কিয়ামতের ময়দানে তুমি হবে শহীদদের নেতা। আমার মন চায় তোমাকে এভাবেই এখানে ফেলে রাখি। পশু পাখি তোমার লাশ ভক্ষণ করতো। কিয়ামতের দিন তোমাকে পশু পাখির পেট থেকে জীবন্ত বের করা হত। কিন্তু তোমার লাশ এভাবে ফেলে গেলে তোমার বোন শোকে অধির হয়ে পড়বে। চাচা! তুমি সৎকাজে অগ্রগামী ছিলে। আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি তোমার কতই না মমতা ছিল!'

আপন ভাই হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে তাঁর বোন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু হযরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা শোকে অধির হয়ে ওহূদের প্রান্তরে ছুটে এলেন। আল্লাহর নবী হযরত সাফিয়ার সন্তান হযরত যুবায়েরকে বললেন, 'তোমার মা'কে তাঁর ভাইয়ের এই করুণ অবস্থা দেখতে দিওনা। সে সহ্য করতে পারবে না।'

হযরত যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর মাতাকে লাশ দেখতে নিষেধ করলেন। হযরত সাফিয়া বললেন, 'আমার ভাই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর নাক-কান ও বুকের কলিজা দান করেছে, এর চেয়ে সৌভাগ্যের আর কি আছে! আমিও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করবো।'

হযরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল তাঁকে হযরত হামজার লাশ দেখার অনুমতি দিলেন। হযরত সাফিয়া ময়দানে আসার পথেই ভাইয়ের কাফনের জন্য দুটো কাপড় এনেছিলেন। মুসলিম বাহিনী আল্লাহর পথে সমস্ত কিছুই উৎসর্গ করেছিলেন। বাকি ছিল শুধু প্রাণ, সে প্রাণও উৎসর্গ করলেন। কাফন দেয়ার মত কাপড়ও ছিল না। হযরত হামজার পাশেই হযরত ছুহায়েন আনসারীর প্রাণহীন দেহ পড়েছিল। তাঁর লাশকেও কাফিররা বিকৃত করেছিল। শহীদদের লাশ একত্র করা হলো। কাফনের যে কাপড় দেয়া হলো, সে কাপড়ে মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যায় আর পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে থাকে। অবশেষে মাথার দিক ঢেকে পায়ের দিকে ইজখির নামক এক ধরণের সুগন্ধ বিশিষ্ট ঘাস দিয়ে দোজাহানের বাদশাহর চাচার লাশ ওহূদের প্রান্তরেই দাফন করা হয়েছিল।

## জীবন্ত শহীদ

ওহূদের ময়দানে নেতৃআদেশ অমান্য করার কারণে সুস্পষ্ট বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা কোন অবস্থাতেই যেন গিরি পথ থেকে সরে না

আসেন। কিন্তু যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছে দেখে তাদের এক দল বলছিল, রাসূলের আদেশ বলবৎ ছিল যুদ্ধ সংঘটিত হবার সময় পর্যন্ত। সুতরাং এখন বিজয় অর্জিত হয়েছে, এখন আর এখানে প্রহরা দেবার কোন প্রয়োজন নেই। আরেক দলের অভিমত ছিল, যুদ্ধে জয়-পরাজয় বলে নয়, রাসূলের পরবর্তী আদেশ না আসা পর্যন্ত এখান থেকে সরা যাবে না।

এ ধরণের মতানৈক্য সৃষ্টি হবার ফলে বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবা স্থান ত্যাগ করে সরে এসেছিলেন। এই সুযোগে মক্কার কুরাইশ বাহিনী অরক্ষিত সেই গিরি পথেই আক্রমন করেছিল। তাদের আক্রমনে ওহুদের রণপ্রান্তরে মুসলিম বাহিনী চরমভাবে পর্যদুস্ত হয়ে পড়েছিল। মুসলমানদের রক্তে ওহুদের প্রান্তরে যেন প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। ইসলাম বিরোধিদের একমাত্র লক্ষ্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া।

সাহাবায়ে কেরাম তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন জানবাজ সাহাবা নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর নবীকে ঘিরে রেখেছেন। শত্রুদের অস্ত্রের আঘাত রাসূলের পবিত্র শরীরে যেন না লাগে, এ জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাসূলকে ঘিরে মানববন্ধন তৈরী করে নিজেদের শরীরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছেন। আল্লাহর রাসূলকে হেফাজত করতে যেয়ে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াজিদ শাহাদাত বরণ করলেন। কাফির বাহিনী নানা ধরণের অস্ত্র দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আক্রমন করছিল।

এ সময় কাফিরদের তীরের আঘাতে হযরত কাতাদা ইবনে নুমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর চোখ কোটর ছেড়ে বের হয়ে এলো। মুখের কাছে এসে চোখ ঝুলতে থাকলো। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে অবস্থান করে কাফিরদের দিকে তীর ছুড়তে থাকলেন। আল্লাহর নবী তুনীর থেকে তীর বের করে হযরত সা'দের হাতে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন, 'হে সা'দ! তোমার ওপর আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক, তুমি তীর চালাও।' হযরত আবু দুজানা আল্লাহর নবীকে এমনভাবে বেষ্টন করেছিলেন যে, কাফিরদের সমস্ত আঘাতগুলো তাঁর দেহেই লাগে এবং আল্লাহর রাসূল যেন অক্ষত থাকেন। হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক হাতে তরবারী ও অন্য হাতে বর্শা নিয়ে নবীর ওপর আক্রমনকারীদেরকে প্রতিহত করছিলেন। এক সময় শত্রুর আক্রমন এতটা তীব্র হলো যে, মাত্র ১২ জন আনসার আর মক্কার মোহাজির হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ব্যতীত আর কেউ নবীর পাশে স্থির থাকতে পারলেন না।

এ অবস্থায় কাফিরদের প্রচন্ড আক্রমনের মুখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষনা করলেন, 'আক্রমনের মুখে শত্রুদেরকে যে পিছু হটতে বাধ্য করবে সে জান্নাতে আমার সাথে অবস্থান করবে।'

হযরত তালহা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি শত্রুদেরকে আক্রমন করবো।' আল্লাহর নবী তাঁকে অনুমতি দিলেন না। আনসারদের মধ্যে একজন বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আক্রমন করতে যাবো।'

আল্লাহর নবী তাঁকে অনুমতি দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি শাহাদাত বরণ করলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার সেই পূর্বের ঘোষনা দিলেন। হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পুনরায় এগিয়ে এলেন। এবারও আল্লাহর নবী তাঁকে নিষেধ করলেন। এভাবে পরপর ১২ জন আনসারই শাহাদাতবরণ করলেন। এবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত তালহাকে এগিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন। হযরত তালহা সিংহ বিক্রমে কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এর মধ্যেই পাপিষ্ঠ আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আঘাত করে তাঁর দান্দান মোবারক শহীদ করলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তাক্ত হয়ে পড়লেন। হযরত তালহা আল্লাহর নবীকে হেফাজত করতে গিয়ে নিজের একটি হাত হারালেন। তিনি রক্তাক্ত দেহে এক হাতেই তরবারী ধারণ করে কাফিরদের আক্রমন প্রতিরোধ করছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে আসছেন। এক পর্যায়ে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিলেন। আল্লাহর নবী তাঁর কাঁধে, কাফিরদের আঘাতে নিজের এক হাত বিচ্ছিন্ন। একটি মাত্র হাত দিয়ে তরবারী চালনা করে কাফিরদের আক্রমন প্রতিহত করছেন এবং রাসূলকে নিয়ে নিরাপদ স্থানের দিকে সরে যাবার চেষ্টা করছেন।

চরমভাবে আহত অবস্থায় একজন মানুষকে কাঁধে নিয়ে পাহাড় বেয়ে ওপরে ওঠা এবং শত্রুকে প্রতিহত করা ছিলো খুবই কঠিন ব্যাপার। হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নিজের দেহের প্রতি লক্ষ্য ছিলো না। তাঁর দেহ থেকে তখন অবিরাম ধারায় রক্ত ঝরছিল। সেদিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপ ছিল না। তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে তিনি তখন অনুভব করছিলেন, আল্লাহর নবীকে হেফাজত করতে হবে। এক সময় তিনি আল্লাহর নবীকে নিয়ে পাহাড়ের এক গুহায় পৌছে নবীকে কাঁধ থেকে নামিয়েই জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'আমি আর হযরত উবাইদাসহ অনেকেই অন্য দিকে যুদ্ধ করছিলাম। নবীর সন্ধানে এসে দেখলাম তিনি আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। আমরা তাঁর সেবা-যত্ন করতে অগ্রসর হতেই তিনি বললেন, 'আমাকে নয়, তোমাদের বন্ধু তালহাকে দেখো।'

হযরত আবু বকর বলেন, আমরা দেখলাম তিনি জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর শরীর থেকে একটি হাত বিচ্ছিন্ন প্রায়। গোটা শরীর অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। ৮০ টিরও বেশী আঘাত ছিল তাঁর শরীরে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেফাজত করতে গিয়েই তিনি তাঁর হাত হারিয়ে ছিলেন এবং এতগুলো আঘাত সহ্য করেছিলেন।

আল্লাহর নবী পরবর্তী কালে হযরত তালহা সম্পর্কে বলতেন, 'কেউ যদি কোন মৃত মানুষকে পৃথিবীতে বিচরণশীল দেখতে চায়, তাহলে সে যেন তালহাকে দেখে নেয়।'

হযরত তালহাকে 'জীবন্ত শহীদ' বলা হত। ওহূদের প্রসঙ্গ উঠলেই হযরত আবু বকর বলতেন, 'সেদিনের যুদ্ধের সমস্ত কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন তালহা।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে পৃথিবীতে জীবিত থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন।

## হযরত মুসআব (রাঃ)-এর শাহাদাত

ওহূদের রণপ্রান্তরে ইসলামের শত্রুরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার লক্ষ্যে এগিয়ে এলো। হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করলেন। তিনি ছিলেন ওহূদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পতাকা বাহক। তিনি ক্ষণিকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তাঁর দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত তিনি রাসূলের দেহে সামান্যতম আঘাত বরদাস্ত করবেন না। আল্লাহর নবীর দিকে কাফির বাহিনী শোণিত অস্ত্র হাতে ছুটে আসছে। হযরত মুসআব এক হাতে পতাকা আরেক হাতে তরবারী নিয়ে রাসূলকে নিজের পেছনে রেখে কাফিরদের আক্রমন প্রতিহত করতে থাকলেন।

কাফিরদের ভেতরে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য তিনি তাদের সামনে ভয়ংকররূপ ধারণ করে মুখ দিয়ে ভীতিকর শব্দ সৃষ্টি করতে লাগলেন। এ ধরণের ভূমিকা গ্রহণ করার কারণ হলো, কাফিরদের দৃষ্টি রাসূলের ওপর থেকে সরিয়ে তাঁর নিজের ওপরে নিয়ে আসা। রাসূল যেন নিরাপদে থাকতে পারেন, এটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এভাবে হযরত মুসআব ওহূদের প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর এক করুণ মুহূর্তে নিজের একটি মাত্র সত্ত্বাকে একটি বাহিনীতে পরিণত করেছিলেন। তিনি কাফিরদের সামনে ঢালের মতই ভূমিকা পালন করছিলেন। শত্রুরা তাঁর দেহের ওপর দিয়েই আল্লাহর নবীকে আক্রমন করছিল।

শত্রুদের তীব্র আক্রমনের মুখে যখন মুসলিম সৈন্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তো, তখন হযরত মুসআব একাই শত্রুর সামনে পাহাড়ের মতই অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। রাসূলকে আঘাতকারী জালিম ইবনে কামিয়াহ এগিয়ে এলো। হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে বাধা দিলেন। পাপিষ্ঠ কামিয়াহ তরবারী দিয়ে আঘাত করে হযরত মুসআবের ডান হাত বিচ্ছিন্ন করে দিল।

কাফিরদের তরবারীর আরেকটি আঘাতে হযরত মুসআবের আরেকটি হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি তাঁর কাটা হাতের বাহু দিয়ে ইসলামের পতাকা জড়িয়ে ধরে উড্ডীন রাখলেন। ইসলামের শত্রুরা এবার তাঁর ওপর বর্শার আঘাত হেনে তাঁকে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দিল। তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন।

দাফন-কাফনের সময় হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর লাশ পাওয়া গেল। হাত দুটো তাঁর নেই। তিনি হাত দুটো দিয়ে মহাসত্যের পতাকা ধারণ করেছিলেন, এ অপরাধে শত্রুরা তাঁর হাত দুটো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তাঁর পবিত্র শরীরে রয়েছে জোড়াতালি দেয়া শত ছিন্ন জামা। সে জামাও রক্ত আর বালিতে বিবর্ণ। তবুও তাঁর গোটা মুখমন্ডল দিয়ে যেন জান্নাতের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুসআবের এই অবস্থা দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না।

সাহাবায়ে কেরাম এতক্ষণ নীরবে চোখের পানি ফেলছিলেন, রাসূলের চোখে পানি ঝরতে দেখে সাহাবায়ে কেরাম ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তাঁকে কাফন দেয়ার মত ছোট এক টুকরা কাপড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। সে কাপড় দিয়ে পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত থাকে, মাথা ঢাকলে পা উন্মুক্ত থাকে। তিনি ছিলেন মক্কার ধনীর আদরের দুলাল। তাঁর কাফনের আজ এই করুণ অবস্থা। অথচ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর মত জাকজমক পূর্ণ পোষাক আর সুগন্ধি কেউ ব্যবহার করতো না। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি তরুণ বয়সেই পৃথিবীর সমস্ত বিলাসিতা আর ধন-সম্পদের পাহাড়কে পদাঘাত করে রাসূলের সাথী হয়েছিলেন। হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন। বিশাল ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনি। দৃষ্টি আকর্ষণকারী মূল্যবান পোষাক ব্যবহার করা ছিল তাঁর অভ্যাস। শরীরে তিনি এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতেন যে, তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র আকর্ষণীয় গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠতো। ওহূদের যুদ্ধে তাঁর মা ছিল ইসলামের শত্রুদের দলে। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁর মা তাঁকে বন্দী করে রাখতো। অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত

করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রথম দূত হিসাবেই তাঁকে মক্কা থেকে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন। মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের আলো জ্বালিয়ে দেয়ার একক কৃতিত্ব যেন তাঁরই।

## হযরত হানযালা (রাঃ)-এর শাহাদাত

হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহূদের যুদ্ধে প্রথমে যোগ দিতে পারেননি। ছিলেন সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী সুদর্শন যুবক। কথিত রয়েছে, সুন্দরী তৃণী তরুণী এক ষোড়শীকে তিনি সবেমাত্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন। সেদিন ছিল তাঁর বাসর রাত। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বাসর রাত অতিবাহিত করেছেন। ফরজ গোছল আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু হা'য়ালা আনহু। এমন সময় তিনি সংবাদ পেলেন ওহূদের ময়দানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাতিল কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি ফরজ গোছল উপেক্ষা করে তরবারী হাতে ওহূদের ময়দানের দিকে ছুটলেন। আল্লাহর এই ব্যঘ্র 'আল্লাহু আকবার' বলে গর্জন করে শত্রু বাহিনীর ভেতরে প্রবেশ করে শত্রু নিধন করতে থাকলেন। শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে এক সময় তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।

যুদ্ধ শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শহীদানদের দাফন করছেন। এমন সময় হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সদ্য বিবাহিতা এবং বিধবা স্ত্রী এসে আল্লাহর রাসূলকে জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আমার স্বামীর ওপর গোছল ফরজ ছিল, তাঁকে গোছল না দিয়ে দাফন করবেন না।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবীর লাশের সন্ধান করবেন, এ সময়ে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এসে নবীকে অবগত করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! হানযালাকে গোছল দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এত খুশী হয়েছেন যে, ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁকে গোছল করিয়েছেন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে এ কথা জানিয়ে দিলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর লাশের কাছে গিয়ে দেখলেন, তাঁর লাশ থেকে জান্নাতি সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে আর মাথার চুল ও মুখের দাড়ি থেকে সুগন্ধ যুক্ত পানি ঝরছে। পৃথিবীর সমস্ত আকর্ষণের মাথায় পদাঘাত করে হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহূদের রণক্ষেত্রে ছুটে এসেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর এই উত্তম কর্মের পুরস্কার কিভাবে দান করেছিলেন, পৃথিবীর মানুষ তা ওহূদের রণক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিল।

# হযরত আমর ইবনে জমুহ্ (রাঃ)-এর শাহাদাত

হযরত আমর ইবনে জমুহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন পঙ্গু। মসজিদে নববীর অদূরেই তিনি বাস করতেন। নবীর এই সাহাবী ঠিকভাবে হাঁটতে পারতেন না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন তিনি। তবুও তিনি যুদ্ধে যাবেন। পিতার জিদ দেখে তাঁর সন্তানগণ তাঁকে আটকিয়ে রেখে তাঁর চার সন্তান ওহূদের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার সন্তানগণ আমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে দিচ্ছে না। আমার ইচ্ছা আমি আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণ করে জান্নাতে এভাবে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটবো।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তিদান করেছেন।' এরপর তিনি হযরত আমরের সন্তানদেরকে বললেন, 'তোমাদের পিতা যদি যেতে চায় তাহলে বাধা না দিলেও পারো। আল্লাহ তাঁর ভাগ্যে শাহাদাত লিখে রাখতে পারেন।'

হযরত আমরের সন্তানগণ ওহূদের দিকে চলে গেল। তিনি ভাবলেন, তাঁর সন্তানগণ যদি শাহাদাতবরণ করে, তাহলে তাঁর আগেই তাঁরা আল্লাহর জান্নাতে যাবে। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দেখলেন, একজন কিশোর তরবারী ঝুলিয়ে তাঁর দিকেই আসছে। কিশোর এসে তাঁর কাছে দোয়া চেয়ে ওহূদের দিকে চলে গেল। তিনি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, 'হে আমার আল্লাহ! তুমি আমাকে আর আমার বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না।'

হযরত আমর ইবনে জমুহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহূদের রণপ্রান্তরে উপস্থিত হলেন। মক্কার ইসলাম বিরোধী বাহিনীর ভেতরে তিনি প্রবেশ করে বীর বিক্রমে আক্রমন করলেন। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর আশেপাশেই তাঁর সন্তানগণ যুদ্ধ করছে। তাঁর চোখের সামনে একে একে তাঁর চার সন্তান শাহাদাতবরণ করলেন। কাফিরদের শাণিত অস্ত্র এক সময় তাঁর পঙ্গু দেহকে দ্বিখন্ডিত করে দিল। তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। হযরত আমরের স্ত্রী তাঁর স্বামীর এবং সন্তানদের লাশ গ্রহণ করার জন্য উট নিয়ে রাসূলের সামনে ওহূদের ময়দানে এলেন। লাশ উটের পিঠে উঠিয়ে তিনি উটকে বাড়ির দিকে নিতে চাইলেন। উট স্থির থাকলো। রাসূলকে এ কথা জানানোর পরে তিনি হযরত আমরের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার স্বামী বাড়ি থেকে আসার সময় কি কিছু বলেছিল?'

হযরত আমর ইবনে জমুহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর স্ত্রী জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলেছিল, 'হে আমার আল্লাহ! তুমি

আমাকে আর আমার বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না।' এ কথা শোনার পরে আল্লাহর নবী বললেন, 'আল্লাহ আমরের দোয়া কবুল করে নিয়েছেন। তাকে ওহূদের ময়দানেই অন্তিম শয়নে শুইয়ে দাও।'

## কে শহীদ হয়েছে জানতে চাইনা

হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দেখতে ছিলেন অনেকটা বিশ্বনবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত। ওহূদের ময়দানে পাপিষ্ঠ ইবনে কামিয়াহ আল্লাহর নবীর এই সাহাবীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে ভেবেছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করেছি। এ কারণে সে চিৎকার করে বলেছিল, 'আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করেছি।'

মদীনা শহরে যখন সংবাদ পৌছেছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত নেই তখন মদীনার আবাল বৃদ্ধ বনিতাগণ দলে দলে মাতম করতে করতে ওহূদের ময়দানের দিকে ছুটে এসেছিল। বনী দিনার গোত্রের একজন মহিলা ওহূদের দিকে ছুটে আসছিল। এই মহিলার স্বামী, পিতা ও ভাই ওহূদের যুদ্ধে এসেছিল। মহিলা যখন প্যাগলিনীর ন্যায় ছুটে আসছিল, তখন একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, 'ওহে মহিলা! তুমি কোথায় যাচ্ছো? মহিলা বলেছিল, 'আমি ওহূদের ময়দানে যাচ্ছি।'

লোকটি তাঁকে বলেছিল, 'ওহূদের ময়দানে যেয়ে আর কি হবে, তোমার স্বামী যুদ্ধে এসেছিল, সে শাহাদাত বরণ করেছে।' স্বামীর শাহাদাতের সংবাদ শুনে মহিলা ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন উচ্চারণ করে বলেছিল, 'কে শহীদ হয়েছে জানতে চাই না, বলো আল্লাহর হাবিব কেমন আছে?'

মহিলা এ কথা বলেই পুনরায় ছুটছিল ওহূদের দিকে। এভাবে পরপর তাঁকে তাঁর স্বামী, ভাই ও পিতার শাহাদাতের সংবাদ শোনানো হলে প্রতিবারই সে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন উচ্চারণ করে বলেছিল, 'কে শহীদ হয়েছে জানতে চাই না, বলো আল্লাহর হাবিব কেমন আছে?'

মহিলা ওহূদের ময়দানে উপস্থিত হয়ে সাহাবায়ে কেরামের কাছে জানতে চাইলো, 'বলো আল্লাহর হাবিব কেমন আছে?' সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল ভালো আছেন, তুমি যেমন কামনা করো আল্লাহর নবী তেমনি আছেন।'

মহিলা যেন কথাটি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারলো না, বললো, 'আমি আল্লাহর নবীকে একবার দেখতে চাই, তাঁকে একটু দেখাও।'

মহিলাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো, যেখানে সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক পরিবেষ্টিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসেছিলেন। আল্লাহর রাসূলকে দেখেই মহিলা বলে উঠলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! স্বামী, ভাই ও পিতা চলে গেছে কোন আফসোস নেই, আপনি জীবিত আছেন, এটাই জীবনের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।'

## ওহূদের প্রান্তরে মহিলা সাহাবী

ওহূদের প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর সাথে বেশ কয়েকজন নারীও ছিল। তাঁরা সৈন্যদেরকে পানি পান করাতেন এবং আহতদেরকে সেবা-যত্ন করতেন। হযরত আয়েশা, হযরত আনাসের আম্মা হযরত উম্মে সুলাইম, হযরত উম্মে আম্মারা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা আজমাঈন প্রমুখ নারীগণ মুসলিম বাহিনীর সাথে ছিলেন। তাঁরা মশক ভর্তি করে পানি এনে সৈন্যদেরকে পান করাতেন এবং পানি শেষ হয়ে গেলে পুনরায় মশক ভর্তি করে আনতেন। সৈন্যদের ক্ষতস্থানে তাঁরা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতেন।

তবে ওহূদের যুদ্ধে যত নারীই অংশগ্রহণ করে থাক না কেন, হযরত উম্মে আম্মারা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার ভূমিকার কারণে তাঁর নাম ঐতিহাসিকগণ সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন। তীরান্দাজ বাহিনীর নেতৃ আদেশ অবহেলার কারণে মুসলিম বাহিনী যখন হঠাৎ শত্রুবাহিনীর আক্রমনের শিকার হয়ে পর্যদুস্ত হয়ে পড়েছিল, তখন হযরত উম্মে আম্মারা আহত সৈন্যদের সেবা করায় ব্যস্ত ছিলেন।

তিনি যখন শুনলেন শত্রু বাহিনী চিৎকার করে বলছে, 'কোথায় মুহাম্মাদ! তাঁর সন্ধান করতে থাকো, সে জীবিত থাকলে আমরা কেউ বিপদ মুক্ত নই। তাঁকে হত্যা করতেই হবে।'

এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত উম্মে আম্মারা দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন আল্লাহর নবী যেখানে অবস্থান করছেন, সেদিকে শত্রু বাহিনী ছুটে যাচ্ছে। তিনি একজন নারী, তবুও নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি পানির পাত্র সজোরে নিক্ষেপ করলেন। যৎ সামান্য যে অস্ত্র হাতের কাছে পেলেন তাই উঠিয়ে নিয়ে দ্রুত গতিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। একটি ঢাল যোগাড় করে তিনি শত্রুর আক্রমন প্রতিরোধ করতে লাগলেন। শত্রুর আক্রমন এতটা তীব্র ছিল যে, অনেক বিখ্যাত মুসলিম বীরও ময়দানে টিকে থাকতে পারেননি। অথচ এ ধরণের মারাত্মক এবং নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত উম্মে আম্মারা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা অতুলনীয় বিক্রমে শত্রু বাহিনীকে প্রতিরোধ করছিলেন।

তিনি তীর বেগে ছুটে একবার ডানে এবং আরেকবার বামে যাচ্ছিলেন, যেন শত্রু বাহিনীর কোন সদস্য আল্লাহর নবীর কাছে যেতে না পারে। হযরত উম্মে আম্মারার দুটো সন্তানও ওহূদের ময়দানে যুদ্ধ করছিলেন। শত্রু বাহিনী যখন দেখলো, এই নারীর কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছা যাচ্ছে না, তখন তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, এই নারীকে আগে হত্যা করে তারপর মুহাম্মাদের কাছে অগ্রসর হতে হবে। তখন শত্রু বাহিনী তাঁকেই আক্রমন করলো।

একজন সৈন্য তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর ওপরে তরবারীর আঘাত করলো। হযরত উম্মে আম্মারা সে আঘাত ঢাল দিয়ে প্রতিহত করলেন। তারপর তিনি তরবারীর আঘাত করে শত্রু সৈন্যের ঘোড়ার পা কেটে ফেললেন। ঘোড়া মাটিতে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে শত্রু সৈন্যও মাটিতে পড়ে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে হযরত উম্মে আম্মারার দুই সন্তানকে তাঁদের মায়ের সাহায্যে প্রেরণ করলেন। তাঁরা অগ্রসর হয়ে শত্রুকে জাহান্নামে প্রেরণ করেছিল।

এক পর্যায়ে তাঁর সন্তান আহত হলেন। তিনি সন্তানের ক্ষতস্থানে ব্যন্ডেজ করে দিয়ে আদেশ দিলেন, 'দ্রুত ময়দানে গিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে আম্মারার সাহসিকতা এবং নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যুদ্ধের ময়দানেই তিনি বারবার মহান আল্লাহর কাছে তাঁর এই মহিলার জন্য দোয়া করছিলেন। তিনি অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে শুনিয়ে হযরত উম্মে আম্মারার প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'তাঁর মত সাহাস আর কার আছে!'

লড়াই চলতে থাকলো, হযরত উম্মে আম্মারার সামনে এলো ঐ ব্যক্তি, যে তাঁর সন্তানকে আঘাত করেছিল। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করার লক্ষ্যে শত্রুর দিকে এগিয়ে গেলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সতর্ক করে বললেন, 'হে উম্মে আম্মারা! সতর্ক হও! এই জালিম তোমার সন্তান আব্দুল্লাহকে আহত করেছে।'

আল্লাহর নবীর কথা শুনে হযরত উম্মে আম্মারার শরীরে যেন সিংহের শক্তি এসে জমা হলো। তিনি তরবারী দিয়ে পুত্রের ওপর আঘাতকারীর ওপরে এমন শক্তিতে আঘাত হানলেন যে, তাঁর আঘাতে শত্রু সৈন্য দ্বিখন্ডিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আল্লাহর নবী এই দৃশ্য দেখলেন। একজন মহিলার বীরত্ব দেখে আনন্দে হেসে উঠে বললেন, 'ওহে উম্মে আম্মারা! তুমি তোমার সন্তানের ওপর আঘাত করার কারণে উত্তম প্রতিশোধ গ্রহণ করেছো।' মক্কার কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বীর জাহান্নামী আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়ার সাথেও হযরত উম্মে আম্মারা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ভয়ঙ্কর মুহূর্তে যুদ্ধ করেছিলেন। ইবনে কামিয়াহ বারবার রাসূলকে হত্যা করার জন্য আক্রমন করছিল। এই জালিমও রাসূলের পবিত্র দেহে আঘাত করেছিল। রাসূলের জীবনের এই কঠিন মুহূর্তে হযরত উম্মে আম্মারার মত একজন নারী নিজের জীবন বিপন্ন করে ইবনে কামিয়াকে প্রতিরোধ করছিলেন।

আক্রমনকারী জামিলের দেহ ছিল লৌহ বর্মে আবৃত। হযরত উম্মে আম্মারা জালিমকে হত্যা করার জন্য তরবারীর আঘাত করেন। কিন্তু জালিমের দেহে বর্ম থাকার কারণে তাঁর তরবারী ভেঙ্গে গেল। জালিম এবার সুযোগ পেয়ে উম্মে আম্মারার ওপর আক্রমন করলো। হযরত উম্মে আম্মারা ঢাল দিয়ে সে আঘাত প্রতিহত করতে গিয়েও তাঁর

কাঁধ মারাত্মকভাবে আহত হলো। আহত দেহেই তিনি আল্লাহর দুশমনের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখলেন। তাঁর মোকাবেলায় টিকতে না পেরে জালিম আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁর এই মহিলার ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন, 'আল্লাহর শপথ! আজ উম্মে আম্মারা অনেকের চেয়ে অধিক বীরত্ব প্রদর্শন করেছে।'

ওহূদের প্রসঙ্গ উঠলেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'ওহূদের দিনে আমি আমার ডানে বামে যেদিকেই তাকিয়েছি, সেদিকেই উম্মে আম্মারাকে যুদ্ধ করতে দেখেছি।'

যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, হযরত উম্মে আম্মারার শরীরে ইসলামের শত্রুরা ১২ স্থানে আঘাত করেছে। এতগুলো আঘাত লাগার পরেও তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত হননি। আল্লাহর রাসূলকে অক্ষত রাখার জন্য তিনি নিজের প্রাণের কোন পরোওয়া করেননি। এদের সম্পর্কেই অধ্যাপক হিট্টি কত সুন্দর কথা বলেছেন, The spirit of discipline and contempt of death manifested at this first armed encounter of Islam proved characteristic of it in all its later and greater conquests.(History of the Arabs; Philip K, Hitti)

অর্থাৎ এই সম্মুখ যুদ্ধে মুসলমানগণ যে নিয়মানুবর্তিতা ও মৃত্যুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, ফলে ইসলামের পরবর্তী ও মহত্ত্বর বিজয়ের বিশেষ লক্ষণসমূহ পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

## হযরত আনাস বিন নযর (রাঃ)-এর শাহাদাত

হযরত আনাস বিন নযর একজন আল্লাহর রাসূলের একজন সম্মানীত সাহাবী ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি। এ কারণে তিনি এই বলে আক্ষেপ করতেন, ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল প্রথম যুদ্ধে সকলেই অংশগ্রহণ করলো। কেউ শহীদ কেউ গাজী হয়ে ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে রইলো আর আমি হতভাগ্য এতে যোগ দেয়ার কোন সুযোগই পেলাম না।

দুঃখ ও আক্ষেপে অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হয়ে তিনি সংকল্প করলেন যে, যদি ভবিষ্যতে কোনও জিহাদের সুযোগ মিলে তবে তাঁর এই অসম্পূর্ণ আকাঙ্খা বুকের রক্ত দিয়ে পূর্ণ করবেন।

তাঁকে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হলো না, শীঘ্রই ওহূদ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হলো। তিনি তাঁর প্রাণের দাবী ও মনের আশা আকাঙ্খা নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিলেন।

ওহূদের যুদ্ধে প্রথমতঃ মুসলামদের বিজয় লাভ হয়, কিন্তু শেষ দিকে একটি মাত্র ভুলের জন্য তাঁদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। তাঁদের এই ভুলটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করার কারণেই সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহর নবী পঞ্চাশজন তীরন্দাযকে ওহূদ পর্বতের পেছনের দিকে একটি গিরি পথ প্রহরা দেয়ার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের নির্দেশ ছিলো, কোন অবস্থাতেই যেন তারা ঐ স্থান পরিত্যাগ না করেন। কারণ ঐ পথ দিয়ে শত্রুদের আক্রমণ করার আশঙ্কা ছিল।

যুদ্ধের শুরুতেই মুসলমানদের যখন বিজয় ঘটলো এবং কাফিররা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক-ওদিক ছুটে পালাতে লাগলো, তখন সেই তীরন্দাযগণ মনে করলেন যে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে এখন ঐ স্থান পরিত্যাগ করে শত্রুগণের পশ্চাদ্ধাবন করা এবং তাদের পরিত্যাক্ত সম্পদ কুড়িয়ে নেয়া যেতে পারে। তাঁদের নেতা তাঁদেরকে স্থান ত্যাগ করতে নিষেধও করেছিলেন এবং আল্লাহর নবী আদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা মনে করলেন যে, আল্লাহর নবীর আদেশ শুধু যুদ্ধের সময়ের জন্যই দেয়া হয়েছিল, অন্য সময়ের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। এ কথা মনে করে তাঁরা ঐ স্থান পরিত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন এবং শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পদ কুড়াতে আরম্ভ করলেন।

পলায়নরত শত্রুরা গিরিপথটি অরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে প্রতি আক্রমণের মহাসুযোগ পেয়ে গেলো। তারা ঐ পথ দিয়ে প্রবেশ করে অপ্রস্তুত মুসলমানদের ওপর প্রচন্ডভাবে আক্রমণ করলো। এ অতর্কিত আক্রমণে মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন। সামনে ও পেছনে দু'দিকের আক্রমণে তারা শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লেন এবং নিতান্ত অসহায়ের মতো প্রতিপক্ষের হাতে নির্মমভাবে শাহাদাতবরণ করতে লাগলেন।

হযরত আনাস মুসলমানদের এ দূরবস্থা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তার সম্মুখে হযরত সায়াদকে দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছো সায়াদ? আল্লাহর কসম আমি ওহূদের পর্বত থেকে জান্নাতের খুশবু পাচ্ছি। এই কথা বলেই তিনি শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং যে পর্যন্ত না শহীদ হলেন, অবিরত তলোয়ার চালিয়ে গেলেন।

যুদ্ধ শেষে শহীদানদের লাশ দাফন-কাফনের জন্য একত্রিত করা হলো। হযরত আনাসের লাশ এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছিলো যে, কারো পক্ষে তা সনাক্ত করা সম্ভব ছিলো না। নানা ধরনের অস্ত্রের আঘাতে তাঁর লাশ ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর বোন তাঁর হাতের একটি আঙ্গুল দেখে লাশ সনাক্ত করেছিলেন।

যাঁরা অকৃত্রিম মন-মানসিকতা নিয়ে আল্লাহর কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেন, তাঁরা বাস্তবিকই পৃথিবীতে জান্নাতের সুগন্ধ পেয়ে থাকেন; হযরত আনাস জীবিত অবস্থায় জান্নাতের সুগন্ধ পেয়েছিলেন।

## আমার পিতাকে আমিই হত্যা করি

মদীনা থেকে ৯ মাইল দূরে মরিসী নামক স্থানে বনী মুস্তালিক নামক একটা গোত্র বাস করতো। এই গোত্রের নেতার নাম ছিল হারিস আবু জোয়ার। কুরাইশদের উস্কানিতে এই লোকটি মদীনা আক্রমন করার মত এক হঠকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ জানার পরে হযরত যায়িদ ইবনে খুবাইস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সেই গোত্রে প্রেরণ করে সংবাদের যথার্থতা যাচাই করতে বললেন। তিনি ঘটনা যাচাই করে দেখলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা শুনেছেন, তা সত্য। আল্লাহর নবী মদীনা থেকে বিশাল এক মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। মুসলিম বাহিনী আসছে, এ সংবাদ শুনেই বনী মুস্তালিক গোত্র নেতা হারিস কর্তৃক সমবেত বাহিনী প্রাণ নিয়ে যে যেদিকে পারলো, তীর বেগে ছুটে পলায়ন করেছিল। গোত্র প্রধান নিজেও পালিয়ে গেল।

তবে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীগণ মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর আক্রমনের মুখে তারা টিকতে পারেনি। প্রতিপক্ষের দশজন সৈন্য মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল। বন্দী হয়েছিল ৬ হাজারের মত। এই যুদ্ধে মুসলমানরা প্রচুর গণিমতের সম্পদ লাভ করেছিল। গণিমতের লোভে এমন কিছু লোকজন এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, যারা ছিল মুনাফিক। তারা মদীনার আনসার আর মক্কার মুহাজির মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধানোর চেষ্টা করেছিল। পরে কতিপয় বিচক্ষণ সাহাবার হস্তক্ষেপে কোন ধরণের বিশৃংখলতা সৃষ্টি হয়নি।

মদীনায় এ সংবাদ এলে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই আনসারদেরকে বলেছিল, 'তোমরা তো খাল কেটে কুমীর এনেছো। যাদেরকে তোমরা আশ্রয়দান করেছো, তারাই এখন তোমাদের প্রতি রক্তচক্ষু দেখায়। তোমরা এই মোহাজিরদেরকে সাহায্য করা বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দাও।'

যখন মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই আনসারদেরকে উক্ত কথাগুলো বলছিল, তখন সেখানে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উপস্থিত ছিলেন। মুনাফিক নেতার কথা শুনে তিনি প্রচন্ড রাগে কাঁপছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অনুমতি দিন, এই মুনাফিকের মাথা যেন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।' করুণার সিন্ধু ধৈর্যের প্রতিচ্ছবি বিশ্বনবী মৃদু হেসে জবাব দিলেন. 'হে ওমর! তুমি কি এটা পছন্দ করো যে, আমি আমার সাথীদেরকে হত্যা করি?'

এই মুনাফিকরা ছিল এমনই এক বিপদ যে, তারা মসজিদে এসে নামায আদায় করতো এ কারণে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষনা দিয়ে তাদের ঘৃণ্য কর্মকান্ডের জন্য হত্যাও করা যেত না, আবার সহ্যও করা যেত না। আল্লাহর নবী শেষ পর্যন্তও ধৈর্যের পথই অবলম্বন করেছেন। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়ের অবাক করার মত ঘটনা ছিল যে, সে যতটা যোগ্যতা দিয়ে ইসলামের বিরোধিতা করতো, তার সন্তান তার চেয়ে অধিক যোগ্যতা দিয়ে ইসলামের খেদমত করতো। তার সন্তানের নাম ছিল আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু । আল্লাহর রাসূলের কারণে প্রাণদানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন তিনি। অথচ তার পিতা ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রু। এ ধরণের অবস্থা তখন যেমন ছিল, বর্তমানে সে অবস্থার তুলনায় অধিক কঠিন অবস্থা বিরাজ করছে।

সে সময় মুনাফিকদের সংখ্যা যা ছিল, বর্তমানে তারচেয়ে কয়েক কোটি গুণ বেশী মুনাফিক মুসলমানদের মধ্যে মাওলানা, আলিম, শাইখ নাম নিয়েই অবস্থান করছে। কোন মুসলিম দেশে, আল কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারে কোন ইয়াহুদী বা খৃষ্টান অথবা ভিন্ন কোন ধর্মের অনুসারীরা এসে বাধার সৃষ্টি করছে না। মুসলিম নামধারী মুনাফিকরাই প্রচন্ড বাধার সৃষ্টি করছে। এই মুনাফিকরা বর্তমানে রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে মসজিদের ইমামের ও মাদ্রাসার শিক্ষকের পদ পর্যন্ত দখল করে রেখেছে। অর্থাৎ ইসলামের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করার লক্ষ্যে মুনাফিকরা প্রতিটি ক্ষেত্রে অবস্থান গ্রহণ করেছে। তারা বিসমিল্লাহ পাঠ করেই ইসলামের বিধান কোরবানী করছে।

মুনাফিক নেতার ওপরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চরমভাবে অসন্তুষ্ট, এ সংবাদ মদীনায় পূর্বেই প্রচার হয়েছিল। সেই সাথে আরেকটি গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যা করা হবে। তার সন্তান হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! সবাই জানে আমি আমার পিতার ওপর দুর্বল। আপনি যদি আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েই থাকেন, তাহলে সে আদেশ আমাকেই কার্যকর করতে দিন। আমি নিজেই আমার পিতার মাথা কেটে আপনার সামনে হাজির করবো। অন্য কেউ আমার পিতাকে

হত্যা করলে আমি হয়ত নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে তাকেই হত্যা করতে পারি।' আল্লাহর নবী হযরত আব্দুল্লাহকে জানালেন, 'আমি তোমার পিতাকে হত্যা করার পরিবর্তে তার ওপর অনুগ্রহই করে যাবো।'

যখন মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মৃত্যু বরণ করেছিল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র শরীর মোবারকের জামা দান করেছিলেন তার কাফনের জন্য। তিনি মুনাফিক নেতার নামাজে জানাযাও আদায় করেছিলেন। যে লোকটি তার গোটা জীবন ব্যয় করেছে, নবীকে নানা ধরণের সমস্যায় নিক্ষেপ করার জন্য, নবীকে হত্যা করার ক্ষেত্রে সহযোগীতা করেছে, আর স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কর্মকান্ডের বিনিময় দান করেছেন মহনুভবতা দিয়ে।

## খন্দকের যুদ্ধ– Battle of the Confederates

হিজরী পাঁচ সালে ইসলামের ইতিহাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের মূলেও ছিল ষড়যন্ত্রকারী ইয়াহুদী সম্প্রদায়। তারা মদীনা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গোটা আরবে ছড়িয়ে পড়ে প্রতিটি গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল। যে সমস্ত গোত্র মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল, তারা তাদেরকে বাধ্য করেছিল চুক্তিভঙ্গ করতে। প্রথমে তারা গিয়েছিল মক্কায় কুরাইশদের কাছে। কুরাইশদেরকে তারা বলেছিল, মুসলমানদেরকে যদি তারা মদীনা থেকে উৎখাত করতে চায় তাহলে তারা যে কোন ধরণের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

কুরাইশরা তাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেই ইয়াহুদীদের পরিকল্পনা মত ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইয়াহুদীরা গাতফান গোত্রে গিয়ে তাদেরকে লোভ দেখালো, যদি তারা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে তারা খায়বরে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক দিয়ে দিবে। এভাবে তারা সমস্ত গোত্রে ভ্রমণ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরবের গোত্রগুলোকে একত্রিত করে ১২ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী এবং প্রচুর রসদ সংগ্রহ করেছিল। এই বিশাল বাহিনী তারা তিনভাগে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক সেনাপতি নির্বাচিত করেছিল।

খন্দকের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য একটি বিরাট পরীক্ষা। এতবড় বিশাল বাহিনী এবং এ ধরণের ভয়াবহ অবস্থার মোকাবেলা মুসলমানরা ইতোপূর্বে আর কোনদিন করেনি। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ খন্দকের যুদ্ধকে Battle of the Confederates বা 'সম্মিলিত শক্তিসমূহের যুদ্ধ' নামে অভিহিত করেছে। ইসলাম, মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র এবং মুসলমানরা টিকে থাকবে কিনা–এসব প্রশ্ন তখন

অনেকের মনেই উদয় হয়েছিল। কারণ, গোটা আরবের এমন কোন গোত্র বাকি ছিল না, কুরাইশদের চাপে যারা এই যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেনি। মদীনার আশপাশে যারা যাযাবর বেদুঈন ছিল, কুরাইশরা তাদেরকেও তাদের সাথে সহযোগিতা করতে বাধ্য করেছিল।

তারপর ছিল, মদীনার অভ্যন্তরে মুনাফিক গোষ্ঠী ও ইয়াহূদীদের গোত্র বনী কুরাইজা। ইয়াহূদীদের আরো দুটো গোত্র বনী কাইনুকা ও বনী নজীরকে অপকর্মের জন্য মদীনা থেকে বহিষ্কার করার কারণে বনী কুরাইজা গোত্র মুসলমানদের প্রতি প্রচন্ডভাবে অসন্তুষ্ট এবং শত্রু ভাবাপন্ন ছিল। সুতরাং মদীনার অভ্যন্তরের ইয়াহূদীদের জন্য মুসলমানদের ওপরে চরম প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিল খন্দকের এই যুদ্ধ। এক কথায় বলতে গেলে এক আল্লাহ্ ব্যতীত মুসলমানদের আর দ্বিতীয় কোন সাহায্যকারী ছিল না। ইতোপূর্বের যুদ্ধসমূহে সারা আরব এভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়নি, এবারের যুদ্ধে যেভাবে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের এই যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ জেনে তিনিও দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। প্রায় তিন হাজার সৈন্য সংগ্রহ করা হলো। আল্লাহর নবী পরামর্শ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামের এক বৈঠক আহ্বান করলেন। হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পরামর্শ দিলেন, মদীনার যেদিকটি অরক্ষিত– সেদিকে পরিখা খনন করার জন্য। মদীনার তিনদিক ছিল খেজুর গাছ এবং বাড়ি ঘরে পরিপূর্ণ। সিরিয়া যেদিকে অবস্থিত সেদিক ছিল উন্মুক্ত। হযরত সালমান ফারসীর পরামর্শ গ্রহণ করে আল্লাহর নবী পরিখা খননের উপকরণ যোগাড় করলেন।

আরববাসী ইতোপূর্বে কখনো যুদ্ধের এই কৌশল দেখেনি। এই কৌশল দেখে তারা অবাক হয়ে গিয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং খননের সীমানা নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি প্রতি দশজনকে ত্রিশ ফুট গর্ত খননের আদেশ দিলেন। পরিখার গভীরতা ছিল পনের ফুট। তিন হাজার স্বেচ্ছাবক ও স্বয়ং আল্লাহর নবী একত্রে শ্রম দিয়ে বিশ দিনে এই খনন কাজ সমাপ্ত করেছিলেন। ধারণা করা হয় এই পরিখা ৭৫০০ ফুট দীর্ঘ ছিল। সময় ছিল শীতকাল। তার ওপরে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। মুসলমানদের কাছে তেমন খাদ্যও ছিল না। এই অবস্থার মধ্যেই তাঁরা অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন।

পূর্ণ উদ্যোমে কাজ চলছে। সাহাবায়ে কেরাম যিনি যা পারছেন, তাই এনে আল্লাহর রাসূলকে এবং সঙ্গী-সাথীদেরকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করছেন। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জানেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

অনাহারে আছেন। তাঁর বাড়িতে সামান্য খাদ্য রয়েছে। আল্লাহর রাসূল অনাহারে আছে আর তিনি কেমন করে সে খাদ্য আহার করবেন? তিনি বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে কিছু রুটি প্রস্তুত করতে বললেন এবং একটা ছাগল জবেহ করলেন। তারপর চুপিসারে আল্লাহর নবীকে জানালেন, কিছু আহাবের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষুধার্ত সাথীদের রেখে একা আহার করবেন, তা হয় না। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে বললেন, 'জাবির আমাদেরকে কিছু আহার করাতে চায়, তোমরা আমার সাথে এসো।'

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবীর এমন আচরণ দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি এ কি করলেন! সামান্য কয়েকটি রুটি, আর এতগুলো মানুষ, কি দিয়ে কি হবে! তিনি বাড়ির দিকে ছুটলেন এবং স্ত্রীকে সব কথা জানালেন। আল্লাহর বান্দি বিচলিত না হয়ে বললেন, 'আল্লাহর নবী কেন এমন করলেন, তা তিনিই জানেন।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একহাজার সাথীকে নিয়ে হযরত জাবিরের বাড়িতে গেলেন। তিনি খাদ্যপাত্রে নিজের পবিত্র হাত দিয়ে খাদ্য বন্টন করতে থাকলেন। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, ক্ষুধার্ত সাহাবায়ে কেরাম পেটপুরে আহার করার পরেও খাদ্য উদ্বৃত্ত রয়ে গেল। আল্লাহর নবীর নেতৃত্বে পরিখা খনন শেষ হবার পরে সৈন্য সমাবেশের আয়োজন করা হলো। পেছনের দিকে পাহাড় রেখে সেন্য সমাবেশ করা হলো। অভ্যন্তরীণ ইয়াহুদীদের আক্রমনের আশংকায় নারী ও শিশুদেরকে মদীনা শহরের শক্তিশালী দূর্গে প্রেরণ করা হলো এবং শহরের নিরাপত্তার জন্য দুইশত সুদক্ষ যোদ্ধা মোতায়েন করা হলো। মদীনার ইয়াহুদী গোত্র বনী কুরাইজা তখন পর্যন্ত নিরপেক্ষই ছিল। বনী কুরাইজার নেতা ছিল কা'ব ইবনে আসাদ। ইতোপূর্বে বহিষ্কৃত বনী নজীর গোত্রের নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব এলো বনী কুরাইজা গোত্রের নেতা কা'বের কাছে।

কা'ব প্রথমে তার সাথে সাক্ষাৎই করতে চায়নি। অনেক অনুরোধের পরে সে সাক্ষাৎ করতে রাজি হয়েছিল। হুয়াই ইবনে আখতাব তাকে বলেছিল, 'আমি সারা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে মদীনা আক্রমন করার জন্য বিরাট এক বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছি। এবার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হবে। তুমিও চুক্তিভঙ্গ করে আমাদের সাথে যোগ দাও।'

চুক্তিভঙ্গ করতে অস্বীকার করে কা'ব বলেছিল, 'তুমি এমন এক মেঘমালা জমায়েত করেছো যে, তা বৃষ্টি বর্ষন করে পানি শুন্য হয়ে গেছে। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে এমন কোন ব্যবহার করেননি যে, আমাকে চুক্তি

ভঙ্গ করতে হবে। তুমি চলে যাও।' কিন্তু হুয়াই ইবনে আসাদ ছাড়ার পাত্র ছিল না। নানা ধরণের মন ভুলানো কথাবার্তা দিয়ে কা'বাকে তার মতের পক্ষে নিয়ে এলো। অবশেষে বনী কুরাইজাও চুক্তিভঙ্গ করলো। মুসলমানদের ওপরে বিপদের ওপরে বিপদ। একদিকে দশ বার হাজার অস্ত্রধারী সৈন্য মদীনা ঘিরে রেখেছে। অপরদিকে মদীনার অভ্যন্তরে সমরাস্ত্রধারী বিরাট ইয়াহূদী শক্তি। হিংস্র হায়েনার দল চারদিক থেকে মুসলমানদেরকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য ছুটে আসছে। ঘরের শত্রু বিভীষণের দল ইয়াহূদী আর মুনাফিকের দল মদীনার ভেতরে বসে বিষাক্ত নিশ্বাস ত্যাগ করছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেলেন, বনী কুরাইজা চুক্তিভঙ্গ করেছে। তিনি সংবাদের সততা যাচাই করার জন্য লোক প্রেরণ করলেন। তাদেরকে তিনি বলে দিলেন, 'ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে ফিরে এসে সংকেতমূলক ধ্বনি দিয়ে আমাকে জানাবে। আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে প্রকাশ্যে ঘোষনা করবে। তাঁরা বনী কুরাইজা গোত্রে গিয়ে দেখলো ঘটনা যা শুনেছিল, বাস্তব পরিস্থিতি তার থেকেও ভয়াবহ। নবীর প্রেরিত সাহাবায়ে কেরাম ইয়াহূদী নেতা কা'বকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইয়াহূদী নেতা তাদের সাথে রুঢ় আচরণ করে বিদায় করে দিল।

সাহাবায়ে কেরাম ফিরে এসে আল্লাহর নবীকে জানালেন, 'আজাল ওয়া কারা'। অর্থাৎ আজাল ও কারা নামক স্থানে হযরত খুবাইব ও তাঁর সাথীদের সাথে যেভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ইয়াহূদীরাও তাই করেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ জেনে মুসলমানদেরকে জানালেন, 'তোমরা শুভ সংবাদ গ্রহণ করো।'

প্রকৃতপক্ষেই এটা ছিল মুসলমানদের জন্য আনন্দের সংবাদ। কারণ মদীনার অভ্যন্তরে ইয়াহূদীরা ছিল পরিধেয় বস্ত্রের ভেতরে সাপ পোষার মত। যে কোন মুহূর্তে তারা ছোবল হানতে পারে। এই ইয়াহূদীদের কারণে মুসলমানদের মধ্যে সবসময় একটা অজানা আতঙ্ক বিরাজ করতো। কখন কোন সময় কোনদিক থেকে কি অঘটন তারা ঘটায়। এবার যখন তারা স্বেচ্ছায় চুক্তিভঙ্গ করেছে, তখন তাদেরকেও মদীনা থেকে বহিষ্কার করার সুযোগ এসে গেল। তাদেরকে বহিষ্কার করলে মদীনায় ইসলামের শত্রুদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে শুধুমাত্র মুনাফিকরা। এরা এমনিতেই ভয়ে আধমরা হয়ে থাকবে। এ কারণেই আল্লাহর নবী সাহাবায়ে কেরামকে সুসংবাদের কথা বলেছিলেন।

পবিত্র কোরআনে সূরা আহযাবে এই খন্দক যুদ্ধের পূর্ণ চিত্র মহান আল্লাহ তুলে ধরেছেন। বলা হয়েছে, শত্রু চারদিকে থেকে এমনভাবে ধেয়ে এসে মুসলমানদেরকে ঘিরে ধরেছিল যে, ভয়ে তোমাদের কলিজা মুখের কাছে এসে গিয়েছিল। তোমাদের

চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে পড়েছিল। শরীরের রক্ত যেন হীম হয়ে আসছিল। তোমাদেরকে এক ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছে, মদীনার অভ্যন্তরে এবং চারদিকে শত্রুর পদভারে মদীনা নগরী থরথর করে যেন কাঁপছিল। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন নির্বিকার। তাঁরা মহান আল্লাহর রহমতের ওপর ছিলেন নিষ্ঠাবান।

এই খন্দকের যুদ্ধে বেশ কিছু মুনাফিকও মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। তারা নানা অজুহাত খুঁজছিল, কি করে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করা যায়। এ কারণে তারা বারবার এসে রাসূলকে বিরক্ত করে বলছিল, 'আমাদের বাড়ি ঘরে নানা সমস্যা রয়েছে, পরিবার পরিজন অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। আপনি অনুমতি দিন, আমরা একটু বাড়িতে যাই।'

মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে জানিয়ে দিলেন, 'তারা আসলে ভেগে যাবার বাহানা সন্ধান করছে।'

এই মুনাফিকরা মুসলমানদের কাছে বলছিল, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লোভ দেখিয়েছিল, আমরা রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের সমস্ত ধন-সম্পদের অধিকারী হবো, অথচ আজ অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, শত্রুর কারণে আমরা মলমূত্র ত্যাগ করার জন্যও বের হতে পারছি না।'

হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পরামর্শে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, অর্থাৎ পরিখা খনন করেছিলেন, তা দেখে শত্রুপক্ষ অবাক হয়ে পড়েছিল। তারা যে আশা নিয়ে সারা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে মদীনা আক্রমন করতে এসেছিল, আল্লাহর নবীর যুদ্ধ কৌশল দেখে তাদের আশার প্রদীপ নিভে গিয়েছিল। তারা বাধ্য হয়ে অবরোধের পথ অবলম্বন করেছিল।

অবাক হবার মত অবস্থা ছিল সাহাবায়ে কেরামের। অনাহারে শরীর চলতে রাজী হচ্ছে না, পরিবার পরিজনের কি অবস্থা তাদের জানা নেই, তাদের সৈন্য সংখ্যাও নগন্য, যুদ্ধের রসদ পত্র নেই, ১০/১২ হাজারের এক হিংস্র বাহিনী তাদেরকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার জন্য লোলুপ জিহ্বা বিস্তার করে আছে। জীবনের এই চরম মুহূর্তেও তাঁরা অটল। তাঁদের ভেতরে কোন ধরণের অস্থিরতা নেই, চেহারায় নেই ভীতির কোন চিহ্ন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা সেদিকেই যাচ্ছেন। রাসূলের নির্দেশ পালনে তাঁরা সামান্যতম গাফলতির পরিচয় দিচ্ছেন না। এই যুদ্ধে মুনাফিকদের আর দুর্বল ঈমানদেরকে আল্লাহর নবী স্পষ্ট চিনে নিয়েছিলেন।

ইসলাম বিরোধিরা পরিখা পার হতে না পেরে পরিখার ওপার থেকেই মুসলমানদের ওপরে ব্যাপক আক্রমন শুরু করেছিল। আক্রমনের তীব্রতা এত বেশী ছিল যে, আকাশ আড়াল করে তীর আসছিল। একজন মুসলিম সৈন্যের এমন কোন সুযোগ ছিল না যে, তাঁরা মাথা উঁচু করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে। দিনের পর দিন শত্রু বাহিনী মুসলমানদেরকে অবরোধ করে রেখেছিল। কোন কিছু আহার করা দূরে থাক মুসলিম সৈন্যগণ সামান্য পানি পানের সুযোগ পাচ্ছেন না। অবস্থা যখন চরমে পৌঁছলো তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, শত্রু বাহিনীর মধ্যে কোন গোত্রকে নিজের পক্ষে নিয়ে এলে তাদের ভেতরে ভাঙ্গন সৃষ্টি হবে।

## ফসল নয়– দেবো অস্ত্রের আঘাত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুপক্ষের গাতফান গোত্রর দুইজন নেতা উয়াইনা ইবনে হিসান এবং হাসের ইবনে আওফের কাছে সংবাদ প্রেরণ করলেন, তারা যদি মদীনা অবরোধ ত্যাগ করে চলে যায় তাহলে মদীনায় উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ তাদেরকে দেয়া হবে। তারা এ প্রস্তাব গ্রহণ করে লিখিত দলীল চাইলো। এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে তাদের সাথে সন্ধি হলো এবং তা লিখিত হলো। তখন পর্যন্ত উভয় পক্ষের কেউ দলীলে দস্তখত করেনি। অবশিষ্ট কাজ শেষ করার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায ও হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমকে ডেকে পাঠালেন।

তাঁরা এসে দলীল দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। নবীর কাছে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা করেছেন তা আপনি আপনার নিজস্ব চিন্তাধারা দিয়ে করেছেন না আল্লাহর ওহীর ভিত্তিতে করেছেন?' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি আমার নিজের চিন্তাধারা প্রয়োগ করে তাদের ঐক্যের ভেতরে ফাটল ধরাণোর জন্য এটা করেছি।'

হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ইতোপূর্বে আল্লাহকে চিনতাম না। নানা ধরণের মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিলাম। তখনও আমরা তাদের ভয়ে সামান্য একটি খোরমাও ছাড় দিইনি। এখন আমরা মুসলমান। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদের সাথে আছেন। সুতরাং এখন তো কোন শক্তিকে সামান্যতম পরোওয়া করার প্রশ্নই ওঠে না। আল্লাহর কসম! কোন ধরণের ফসল দেয়া দূরে থাক, আমরা তাদেরকে তরবারীর আঘাত ব্যতীত আর কিছুই দিব না। এর ভেতর দিয়েই আল্লাহ আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত করবেন।'

আল্লাহর নবী দেখলেন, জীবনের এই চরম মুহূর্তেও সাহাবায়ে কেরামের তেতরে কতটা প্রাণ চাঞ্চল্য। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে বললেন, 'হে সা'দ! তুমিই ঠিক বলেছো।'

এরপর হযরত সা'দ দলীল হাতে নিয়ে সমস্ত লেখা মুছে দিয়ে বললেন, 'আমাদের সাথে আল্লাহ আছেন, শত্রু যা পারে তাই করুক।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এই অবস্থায় দিন অতিবাহিত করতে থাকলেন। কুরাইশরা অধৈর্য হয়ে উঠলো। তারা আক্রমন করার জন্য পরিখার পাশে এসে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিল, 'খোদার শপথ! এটা এমন একটি যুদ্ধ কৌশল যা কোন আরব উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়নি।'

শত্রুর দল সন্ধান করতে থাকলো, কোন দিক দিয়ে পরিখা পার হয়ে মুসলমানদের ওপরে আক্রমন করতে পারবে। ঘটনাক্রমে পরিখার একস্থানের প্রস্থ ছিল এমন যে, তা অতিক্রম করা যায়। শত্রু বাহিনীর কয়েকজন সেদিক দিয়েই পার হয়ে এপারে এসেছিল। এদের মধ্যে আরবের বিখ্যাত বীর আমর ইবনে আবদুদ ছিল। সে এসেই চিৎকার করে ঘোষনা দিল, 'এমন কোন বীর আছে যে আমার তরবারীর সামনে এসে দাঁড়াবে?'

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এগিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সাবধান করে কয়েকবার বললেন, 'এ লোক তো আমর!'

আল্লাহর নবী জানতেন এই আমর আরবের বিখ্যাত বীর। হযরত আলীর মত অল্প বয়স্ক একজন তার মোকাবেলায় টিকবে কিনা, আল্লাহর নবী এ জন্য তাঁকে সাবধান করছিলেন। এই আমর বদরের যুদ্ধে আহত হয়ে প্রতীজ্ঞা করেছিল, প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে মাথায় তেল ব্যবহার করবে না। লোকটি ময়দানে এসে বারবার চিৎকার করছিল তার সামনে যেন মোকাবেলার জন্য কেউ অবতীর্ণ হয়। হযরত আলীও আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন।

পরিশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করে ময়দানে প্রেরণ করলেন। তিনি দোয়া করলেন, 'রাব্বুল আলামীন! বদরের প্রান্তরে উবাইদাকে কাছে টেনে নিয়েছো, ওহূদের ময়দানে হামজাকে গ্রহণ করেছো, আমার আলীকে টেনে নিয়ে তুমি আমাকে স্বজনহারা করো না।

আমর হযরত আলীর কাছে প্রস্তাব দিল, 'আমার কাছে যদি কোন ব্যক্তি তিনটি আবেদন করে তাহলে আমি একটি পূরণ করবো।'

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জানতে চাইলেন, তার ওয়াদা ঠিক কিনা। আমর জানালো তার ওয়াদা ঠিক থাকবে। হযরত আলী তাকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দিল। আমর তা অস্বীকার করলো। এরপর তিনি লোকটিকে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করার পরামর্শ দিল। এবারও সে অস্বীকার করলো। এবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে যুদ্ধের আহ্বান জানালেন। আমর বললো, 'আমার ধারণা ছিল না, আকাশের নীচে কোন মায়ের সন্তান আমাকে যুদ্ধের প্রতি আহ্বান জানাতে পারে।'

এ কথা বলে সে ঘোড়া থেকে নেমে নিজের ঘোড়ার পা নিজেই কেটে ফেললো। কারণ হযরত আলী ছিলেন পদাতিক। বাহাদুরী দেখানোর জন্য আমরও পদাতিক হয়ে গেল। তারপর জানতে চাইলো,'তোমার পরিচয় কি?'

হযরত আলী তাঁর পরিচয় দিলেন, আমর জানালো সে তার সাথে যুদ্ধ করতে আগ্রহী নয়। হযরত আলী জানালেন, 'আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করতে আগ্রহী।'

প্রচন্ড লড়াই শুরু হলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সামান্য আহত হলেন। তারপর তিনি এমন শক্তিতে আঘাত করলেন যে, সে আঘাতে আমরের কোমর পর্যন্ত দু'ভাগ হয়ে গেল। এরপর শত্রুদল একত্রিত হয়ে হযরত আলীর ওপর আক্রমন করলো। মুসলমানরা সে আক্রমন প্রতিহত করে তাদের পেছনে ধাওয়া করলো। কতক শত্রু পালালো আর কয়েকজন পরিখার ভেতরে পড়ে গেল। মুসলমানরা তাদেরকে হত্যা করেছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, যুদ্ধের এই দিনটি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। এ দিনে প্রতিপক্ষ এমনভাবে তীর আর পাথর নিক্ষেপ করছিল যে, মুসলিম বাহিনী স্থান ছেড়ে নড়বে সে উপায় ছিল না।

# অদৃশ্য সেনাবাহিনী

দীর্ঘ অবরোধের কারণেও মুসলমানগণ যখন আত্মসমর্পণ দূরে থাক, বহাল তবিয়তে প্রতিরোধে প্রস্তুত, এ অবস্থা দেখে কুরাইশদেরকে হতাশা গ্রাস করেছিল। আবু সুফিয়ান ধারণা করেছিল, যতবড় বিশাল বাহিনী নিয়ে তারা মদীনা আক্রমন করতে যাচ্ছে, মাত্র কয়েক মুহূর্তের ভেতরে বিজয়ী হয়ে তারা মক্কায় ফিরে আসবে। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা দেখে তার সে ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রমাণ হলো। মুসলিম বাহিনীর কোন সমস্যাই তার চোখে পড়লো না। তাঁরা বীরের মতই পরিখার চারদিকে এবং মদীনা নগরীতে দাপটের সাথে প্রহরা দিচ্ছে। মুসলিম বাহিনীর আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মদীনার আকাশ-বাতাস ছিল মুখরিত।

এতবড় একটি বিশাল বাহিনীর জন্য প্রতি দিন আহারের ব্যবস্থা করা মোটেও সহজ বিষয় ছিল না। শুধু সৈন্যবাহিনীর আহারের ব্যবস্থাই নয়, উট আর ঘোড়ার আহারের ব্যবস্থাও করতে হত। ইসলাম বিরোধী বাহিনী এবার সত্যই যেন এক মহাসমস্যার মুখোমুখি হলো। খায়বর থেকে তাদের জন্য মদীনা থেকে বহিস্কৃত ইয়াহূদী নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব ২০ টি উট বোঝাই করে তাদের এবং যুদ্ধের উট ঘোড়ার খাদ্য প্রেরণ করেছিল। এ সমস্ত উট বোঝাই খাদ্য মুসলমানদের গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হলো।

পবিত্র কোরআনে খন্দকের এই যুদ্ধকে 'আহযাব' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ সূরা আহযাবে বলেছেন–হে ঈমানদারগণ! স্মরণ করো আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি তোমাদের প্রতি দেখিয়েছেন। যখন শত্রু সৈন্যবাহিনী তোমাদের ওপর চড়াও হয়ে আসছিলো তখন আমি তাদের ওপর এক প্রবল ঝড় পাঠিয়ে ছিলাম এবং এমন এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যা তোমরা দেখতে পাওনি। (সূরা আহযাব-৯)

অর্থাৎ সময় মত আল্লাহর সাহায্য এসে উপস্থিত হয়েছিল। এবারের সাহায্য করার ধরণ ছিল পৃথক। একদিকে ছিল প্রচন্ড শীত। এই শীতের রাতে মহান আল্লাহ প্রচন্ড ঝড় সৃষ্টি করেছিলেন। সে ঝড়ের প্রলয়ঙ্করী তান্ডবে ইসলাম বিরোধিদের সমস্ত কিছুই লন্ডভন্ড হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশ তাঁবু কোথায় যে উড়ে গিয়েছিল, তার হদিস তারা বের করতে পারেনি। যুদ্ধের সমস্ত রসদ বিনষ্ট হয়েছিল এবং উট-ঘোড়া মারা পড়েছিল।

আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল তাহলো, গাতফানী গোত্রের নেতা নাঈম ইবনে মাসউদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এ সংবাদ ইসলাম বিরোধিগণ জানতো না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে শত্রু বাহিনীর ভেতরে

প্রেরণ করেছিলেন। তিনি কুরাইশদের পক্ষের গোত্রগুলোর মধ্যে এমনভাবে কাজ করেছিলেন যে, তাদের ঐক্যে চরমভাবে ফাটল ধরেছিল। হযরত নাইম ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়ে এমন ধরণের কথার অবতারণা করেছিলেন যে, তাদের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল। নিজেরা ঝগড়া করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

ইয়াহূদীরা যখন কুরাইশদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখন আবু সুফিয়ান তাদের ব্যবহারে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। সে বারবার অনুরোধ করছিল, ঐক্যে যেন ভাঙ্গন না ধরে এবং সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করে। ইয়াহূদীরা বলেছিল, 'আমাদের ধর্মীয় দিনে আমরা কোনক্রমেই যুদ্ধ করতে পারবো না। কারণ একবার আমরা আমাদের ধর্মের নিষেধ অমান্য করে শুকর আর বানরে পরিণত হয়েছিলাম।'

অবশেষে আবু সুফিয়ান ঘৃণাভরে বলেছিল, 'এই শুকর আর বানরের গোষ্ঠী আমাদের চরম সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়লো।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে প্রেরণ করেছিলেন, ইসলাম বিরোধী বাহিনীর অবস্থা জানার জন্য। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তুমি শত্রুর শরীরে হাত উঠাবে না। তাদের অবস্থা সম্পর্কে জেনে আমার কাছে ফিরে আসবে।'

তিনি শীতের এক গভীর রাতে পরিখা পার হয়ে চুপিসারে বিরোধিদের শিবিরে প্রবেশ করলেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, 'আমি দেখলাম তখনও ঝড় বইছে। তাদের রান্নার চুলাগুলো নিভে গেছে। উট আর ঘোড়াগুলো মরে পড়ে আছে। তাঁবুগুলো সব ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। খাদ্য প্রস্তুতের সরঞ্জামাদি উল্টে পড়ে আছে। চারদিকে অন্ধকার। হঠাৎ আমি আবু সুফিয়ানের কণ্ঠ শুনতে পেলাম। সে তার বাহিনীর লোকদের লক্ষ্য করে বললো, 'তোমরা সাবধান! শত্রুদের কেউ তোমাদের মাঝে প্রবেশ করতে পারে। তোমাদের পাশে কে আছে লক্ষ্য রেখো।'

আবু সুফিয়ানের কথা শুনে আমিই প্রথমে আমার পাশে যে ছিল তার শরীরে হাত দিয়ে বললাম, এই তুমি কে? সে তার পরিচয় দিল। আমি আরেকজনের শরীরে হাত দিয়ে বললাম তুমি কে? সে তার পরিচয় দিল। তারপর আমি আবু সুফিয়ানের হতাশাব্যঞ্জক কথা শুনলাম। সে তার লোকদেরকে বলছে, আমাদের চরম সর্বনাশ ঘটেছে। সমস্ত কিছুই শেষ হয়ে গেছে। আর আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, চলো আমরা ফিরে যাই।'

আমি ইচ্ছা করলে আবু সুফিয়ানকে হত্যা করতে পারতাম। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধ ছিল, আমি যেন কোন ধরণের কিছু না

ঘটাই। তারপর আমি ফিরে এসে তাঁকে শত্রুদের সব ঘটনা জানালাম। তারপরের দিন বিরোধিরা তাদের সমস্ত কিছু গুটিয়ে নিয়ে মদীনা ত্যাগ করেছিল। খন্দকের প্রান্তরে তেমন যুদ্ধ না হলেও শত্রুদের ক্ষতি হয়েছিল বর্ণনাতীত। মহান আল্লাহ্ যে প্রচন্ড ঝড় প্রেরণ করেছিলেন, এই ঝড়েই তাদের যুদ্ধ করার আকাংখা মিটিয়ে দিয়েছিল। মুসলমানদের একজন শ্রেষ্ঠবীর এই খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়ে শাহাদাতবরণ করেছিলেন। মদীনার আউস গোত্রের নেতা হযরত সায়াদ ইবনে মায়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মাতা তাঁকে উৎসাহ দিয়ে দ্রুত যুদ্ধের ময়দানে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর মা তাঁকে বলেছিলেন, 'বাবা! তুমি তো অনেক দেরী করে ফেলেছো। তাড়াতাড়ি জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাও।'

তাঁর দেহের বর্ম ছিল খুবই ছোট। হাত দুটো তাঁর উন্মুক্তই ছিল। এই হাতেই শত্রু পক্ষের বিষাক্ত তীর এসে বিদ্ধ হবার পরে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য মসজিদে নববীর পাশে একটি তাঁবু নির্মাণ করে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে ক্ষত আরোগ্য হয়নি। বেশ কিছু দিন পরে তিনি শাহাদাতবরণ করেছিলেন।

## বিজয় সন্ধিক্ষণে নবী করীম (সাঃ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে সাহাবায়ে কেরামকে জানালেন, 'মক্কায় যেতে হবে। কা'বাঘরে আমরা ওমরাহ্ পালন করতে যাবো।' আল্লাহর নবী মক্কায় ওমরাহ্ আদায় করতে যাবেন–এই ঘোষনার সাথে সাথেই মুসলমানদের এক বিরাট দল প্রস্তুত হয়ে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ঘোষনা করে দিলেন, 'আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য একমাত্র ওমরাহ্ আদায় করা। সুতরাং ওমরাহ্ পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেই এখান থেকে যাত্রা করতে হবে। সাথে একমাত্র আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র বহন করা যাবে না। সে অস্ত্রও থাকবে কোষবদ্ধ। সম্ভব হলে কোরবানীর পশু সাথে নিতে হবে।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ১৪০০ শত সাহাবী মক্কার দিকে 'লাব্বায়েক' ধ্বনি দিতে দিতে যাত্রা করলেন। এ সংবাদ যেন বাতাসের বেগে মক্কার কুরাইশদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লো। তাদেরই পিতা, সন্তান ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন আসবে মক্কায় আল্লাহর ঘরে ওমরাহ্ আদায় করতে, এটাও তারা সহ্য করবে না। তারা প্রতীজ্ঞা করলো, কোন মুসলমানকে তারা মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। তাদের মিত্র গোত্রের কাছে সংবাদ দিয়ে তারা যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হলো।

আল্লাহর নবী জুলহুলাফা নামক স্থানে এসে কোরবানীর পশুর গলায় ফিতা বেঁধে দিলেন। যেন বিরোধিরা অনুভব করতে পারে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করতে আসেননি, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর ঘরে ওমরাহ পালন করা। তারপর তিনি কুরাইশদের সংবাদ জানার জন্য খাজায় গোত্রের একজন মুসলমানকে মক্কার দিকে প্রেরণ করলেন। এই ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, এ কথা কুরাইশরা জানতো না। আল্লাহর নবী যখন মুসলমানদের নিয়ে গাছফান নামক স্থানে এসে উপনীত হলেন, তখন তাঁর প্রেরিত সংবাদ সংগ্রহকারী এসে তাঁকে জানালো, কুরাইশরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তারা কিছুতেই মক্কায় মুসলমানদেরকে প্রবেশ করতে দিবে না।

কুরাইশরা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিশাল এক বাহিনী নিয়ে মক্কার অদূরে বালদাহ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলো। ইতিহাস বিখ্যাত জেনারেল খালিদ, তখন পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি এবং আবু জাহিলের পুত্র ইকরামা একটি বহিনী নিয়ে গামিম নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদের বললেন, 'কুরাইশরা আমাদের সংবাদ গ্রহণ করার জন্য খালিদকে প্রেরণ করেছে। সে গামিম নামক স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে। এ কারণে আমরা ডানদিকের পথ ধরে অগ্রসর হবো।'

আল্লাহর নবী সে পথ ধরে তাঁর প্রিয় সাথীদের নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মক্কার অদূরে হোদায়বিয়া নামক স্থানে এসে উপনিত হলেন। এই স্থানটি ছিল পানি শুন্য। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই স্থানে একটি মাত্র কুয়া ছিল, কিন্তু সে কুয়াতেও পানি ছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে সে কুয়ায় মহান আল্লাহ পানি দান করলেন। এই পানিতেই মুসলমানদের পানির অভাব দূর হয়ে গেল। বুদায়েল ইবনে দারকা নামক একজন লোক ছিল, তার গোত্রে নাম হলো খাজায়া। এই গোত্র ইসলাম কবুল না করলেও তারা ইসলামের মিত্র ছিল। কুরাইশদের তৎপরতার সমস্ত সংবাদ আল্লাহর নবীর কাছে প্রেরণ করতো। এই গোত্র মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

বুদায়েল ইবনে দারকা যখন জানতে পারলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন, তখন সে কয়েকজন সাথী নিয়ে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলো। সে আল্লাহর নবীকে জানালো, 'আপনাকে কুরাইশরা মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। এ জন্য তারা এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে।'

তিনি তাকে জানালেন, 'তুমি কুরাইশদেরকে জানাও, আমি যুদ্ধ করার জন্য আসিনি। আমাদের উদ্দেশ্য ওমরাহ করা। ঐ আল্লাহর কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, তবে তারা যদি আমার কথায় রাজি না হয়, তাহলে আমরা এমনভাবে যুদ্ধ করবো যেন আমার ঘাড় পৃথক হয়ে যায়। আল্লাহ কোন ফয়সালা করতে ইচ্ছুক হলে তা অবশ্যই

করবেন।' কুরাইশদের সংবাদ দাতা খালিদ মুসলমানদের অবস্থান জেনে দ্রুত ছুটে গিয়ে তাদেরকে জানালো, 'মুসলমানরা প্রায় মক্কার কাছেই এসে গেছে।' আল্লাহর নবীর প্রেরিত বুদায়েল ইবনে দারকা কুরাইশদের কাছে গিয়ে জানালো, 'আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থেকে একটা প্রস্তাব এনেছি। যদি তোমরা অনুমতি দাও তাহলে আমি সে প্রস্তাব পেশ করতে পারি।'

কুরাইশদের কয়েকজন কলহ প্রিয় লোক তাকে বললো, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন প্রস্তাব আমরা শুনতে ইচ্ছুক নই। তোমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছে, তা তোমার কাছেই রাখো।'

প্রকৃতপক্ষে সে সময় কুরাইশদের যুদ্ধ করার মত অবস্থা আর অবশিষ্ট ছিল না। পরপর কয়েকটি যুদ্ধ করতে গিয়ে, তাদের অর্থনীতির মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়েছিল। বড়বড় যোদ্ধারা নিহত হয়েছিল। যে কয়জন অবশিষ্ট ছিল, তারা এই ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। সুতরাং কুরাইশদের বিচক্ষণ কয়েকজন লোক বুদায়েল ইবনে দারকাকে করুণ কণ্ঠে বললো, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এমন প্রস্তাব তোমার কাছে দিয়েছে বলো।'

বুদায়েল তখন জানালো, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করতে আসেননি। তিনি এসেছেন ওমরাহ্ করতে। তোমরা যদি তাকে ওমরাহ্ করতে না দাও তাহলে তিনি অবশ্যই যুদ্ধ করবেন।'

তার এ কথা শুনে ওরউয়া ইবনে মাসুদ সাকাফী নামক একজন বিচক্ষণ এবং প্রবীণ লোক উঠে দাঁড়িয়ে কুরাইশদেরকে বললো, 'তোমরা কি আমার সন্তানের মত এবং আমি কি তোমাদের পিতার মত নই? আমার সম্পর্কে কি তোমাদের কোন অভিযোগ আছে?'

সমবেত জনমন্ডলী তাকে জানালো, 'তুমি অবশ্যই আমাদের পিতার মত আর আমরাও তোমার সন্তানের মত। তোমার বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। এখন তুমি কি বলতে চাও তাই বলো।'

ওরউয়া ইবনে মাসুদ সাকাফী তখন বললো, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। তোমরা যদি আমাকে অনুমতি দাও তাহলে আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে সমস্যার সমাধান করে আসি।'

ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর নবীর সাথে কোন ধরণের আলোচনা হবে কি হবে না, এ সম্পর্কে খোদ কুরাইশদের ভেতরেই দুটো দলের সৃষ্টি হয়েছিল। একদল ছিল আলোচনার পক্ষে অপর দল ছিল বিপক্ষে। অবশেষে আলোচনার পক্ষের

বিচক্ষণ ব্যক্তিদের দল জয়ী হলো। তারা ওরউয়া ইবনে মাসুদ সাকাফীকে তাদের শর্ত দিয়ে আলোচনার জন্য আল্লাহর নবীর কাছে প্রেরণ করেছিল। ওরউয়া ইবনে মাসুদ সাকাফী বিশ্বনবীর কাছে আগমন করে আলোচনা শুরু করলো। তার আলোচনার ভাষা থেকেই উপলব্ধি করা যায়, কুরাইশরা কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সে প্রথমেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল, 'হে মুহাম্মাদ! তুমি কি মনে করো যে কুরাইশদের নির্মূল করবে, তাহলে আমি বলতে চাই, এমন কোন দৃষ্টান্ত আছে নাকি যে, কেউ তাঁর জতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে? আর যদি তুমি যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই এসে থাকো তাহলে তোমার সাথীরা তোমার পাশে থেকে ধূলা-বালির মতই উড়ে যাবে।'

লোকটির শেষের কথার অর্থ ছিল, তোমার সাথীরা তোমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শেষের এই কথাটি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ক্ষোভের সাথে বললেন, 'তোমার ধারণা আমরা আল্লাহর রাসূলকে ত্যাগ করে পালিয়ে যাবো?'

ওরউয়া ইবনে মাসুদ সাকাফী বিশ্বনবীর দিকে তাকিয়ে হযরত আবু বকরের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই লোকটি কে?'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিচয় দিলেন। মাসুদ সাকাফী হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বললো, 'আমি তোমার কথার জবাব দিতাম, কিন্তু তুমি আমার যে উপকার একদিন করেছিলে, তার প্রতিদান আমি আজও দিতে পারিনি বলে জবাব দিলাম না।' তারপর লোকটি আল্লাহর নবীর সাথে আলোচনা করতে থাকলো।

## আমার তরবারী তোমার হাত ফিরিয়ে দেবে

তদানীন্তন আরবের প্রথা ছিল যে, কথা বলার সময় প্রতিপক্ষের দাড়িতে হাত স্পর্শ করে কথা বলা। ওরউয়া ইবনে মাসুদ সাকাফী বিশ্বনবীর পবিত্র দাড়িতে তার হাত স্পর্শ করে কথা বলছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে হযরত মুগিরা ইবনে শো'বা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শানিত তরবারী হাতে ওরউয়া ইবনে মাসুদ সাকাফীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। লোকটি বারবার তার হাত নবীর পবিত্র দাড়িতে স্পর্শ করছিল।

এটা আরবের চিরন্তন প্রথা। আল্লাহর নবী স্বয়ং এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করলেনি। কিন্তু প্রিয় সাহাবী মুগিরা ইবনে শো'বা তা সহ্য করতে পারলেন না। একজন কাফির মুশরিক ব্যক্তি নবীর পবিত্র দাড়িতে হাত দিবে, বর্তমান চৌদ্দশত সাহাবী তাঁর সাথে থাকতে! হযরত মুগিরা ইবনে শো'বা সিংহের মতই গর্জন করে বললেন, 'ওরউয়া!

তোমার হাত সরিয়ে নাও! আর একবার যদি তোমার হাত আল্লাহর রাসূলের দাড়ি স্পর্শ করে, তাহলে আমার তরবারী তোমার হাত ফিরিয়ে দেবে।' একজন অমুসলিম আরবের প্রথা অনুসরণ করেছে, এটা সে সময় কোন মর্যাদাহানীকর বিষয়ও ছিল না। তখন মুসলমানদের সংখ্যাও মাত্র কয়েক হাজার। সেই কঠিন মুহূর্তেও তাঁরা নবীর প্রতি সামান্য অমর্যাদা সহ্য করেননি। আর বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা একশত পঞ্চাশ কোটির মতো। তাদের সামনে নবীকে গালি দেয়া হয়, মসজিদ ভাঙ্গা হয়, নবীর বিরুদ্ধে চরম আপত্তিকর কথা লেখা হয় অথচ মুসলমানরা নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এই জাতি পৃথিবীতে লাঞ্ছনা ভোগ করবে না তো কি ভিন্ন কোন জাতি করবে?

ওরউয়া ইবনে মাসুদ সাকাফী হযরত মুগিরা ইবনে শো'বা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর দিকে তাকিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো, 'এই লোকটি কে?'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিচয় দেয়ার পরে সে হযরত মুগিরাকে বললো, 'আমি তোমার কি কোন উপকার করিনি?'

হযরত মুগিরা ইবনে শো'বা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বেশ কয়েকজন লোককে হত্যা করেছিলেন মক্কায়। তখন ওরউয়া ইবনে মাসুদ সাকাফী নিজের পক্ষ থেকে নিহতদের রক্তপণ আদায় করেছিল। সেই ঘটনার দিকেই লোকটি হযরত মুগিরা ইবনে শো'বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ওরউয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যতক্ষণ আলোচনা করছিল, ততক্ষণ সে সাহাবায়ে কেরামের ব্যবহার এবং তাদের চলাফিরার প্রতি দৃষ্টি রাখছিল। রাসূলের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ব্যবহার দেখে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিল। মানুষ যে আরেকজন মানুষকে এতটা ভক্তি শ্রদ্ধা করতে পারে অকৃত্রিমভাবে, এটা ছিল তার কল্পনার অতীত। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে সাহাবায়ে কেরামের আচরণ লক্ষ্য করছিল।

সে তার বিস্ময় চেপে রাখতে পারেনি। কুরাইশদের কাছে ফিরে এসে বলেছিল, 'আমি পারস্য ও রোম সম্রাটের দরবার দেখেছি, নাজ্জাশীর দরবার দেখেছি। কিন্তু কোন মানুষকে অন্য কোন মানুষ যে এত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পারে, হৃদয় দিয়ে যে এভাবে আদেশ পালন করতে পারে, এভাবে আনুগত্য করতে পারে আমি তা কোন দিন কোন দরবারে দেখিনি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর অনুসারীরা কি যে ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তাঁর আদেশ যে কিভাবে তাঁরা প্রতিযোগিতামূলকভাবে পালন করে, তা তোমরা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না। তিনি যখন অজু করেন, তখন অজুর সেই পরিত্যক্ত পানি শরীরে স্পর্শ করার

জন্য সাহাবায়ে কেরাম প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। তিনি যখন তাঁর মুখ থেকে কফ বা থুথু নিক্ষেপ করেন, সাহাবায়ে কেরাম সে থুথু কার আগে কে নিবে, প্রতিযোগিতা করতে থাকে। সেই থুথু তাঁরা শরীরে মাখে। আমি ভক্তি-শ্রদ্ধার এই ধরণের দৃষ্টান্ত কোথাও দেখিনি। তবে তোমরা যদি এ ধারণা করে থাকো যে, তোমাদের আক্রমনের মুখে তাঁর সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে ত্যাগ করে পালাবে, তাহলে মনে রেখো, পৃথিবীর কোন কিছুর বিনিময়েও তাঁরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ত্যাগ করবে না।'

## বাইয়াতুর রিদওয়ান বা প্রাণোৎসর্গের অঙ্গীকার

কুরাইশদের মনের ইচ্ছা জানার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের উট দিয়ে হযরত খোরাস ইবনে উমাইয়া খাযায়ী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে মক্কায় প্রেরণ করলেন। কিন্তু হতভাগারা বিশ্বনবীর উটটিকে হত্যা করলো এবং হযরত খোরাসকেও হত্যা করতে প্রস্তুত হলো। মক্কার কিছু গোত্র তাঁর পক্ষে এগিয়ে এসে তাঁকে রক্ষা করেছিল। তিনি কোনক্রমে আল্লাহর নবীর কাছে এসে ঘটনা জানালেন। কুরাইশরা একেরপর আরেক জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েই চললো। তারা একদল যোদ্ধা প্রেরণ করলো মুসলমানদের ওপর আক্রমন করার জন্য। হতভাগারা কোন ধরণের রক্তপাত ঘটানোর পূর্বেই মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সবাইকে ক্ষমা করে কোন ধরণের বিনিময় ব্যতীতই মুক্তি দিলেন। কুরাইশদের শত উস্কানির মুখেও তিনি বারবার চেষ্টা করতে থাকলেন, যেন কোন ধরণের অপ্রীতিকর কিছু না ঘটে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে মক্কায় প্রেরণ করলেন। তিনি মক্কায় গিয়ে হযরত আব্বাস ইবনে সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে উঠলেন। কুরাইশরা তাঁকে নজর বন্দী করে রাখলো। তিনি মক্কার কুরাইশদের কাছে আল্লাহর নবীর প্রস্তাব পেশ করলেন। কুরাইশ নেতারা তাঁকে জানালো, 'তোমার যদি কা'বাঘর তাওয়াফ করার ইচ্ছা থাকে তাহলে তাওয়াফ করে নাও।'

হযরত ওসমান বললেন, 'আল্লাহর রাসূল তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তাওয়াফ করবো না।' এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত ওসমানকে হতভাগারা বন্দী করে রাখলো। এর মধ্যে একজন উড়ো সংবাদ নিয়ে এলো হযরত ওসমান কুরাইশদে হাতে শাহাদাতবরণ করেছেন। আল্লাহর নবীর ধৈর্যের বাঁধ এবার ভেঙ্গে গেল। তিনি ঘোষনা করলেন, 'ওসমানের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আমরা যুদ্ধ না করে এই স্থান ত্যাগ করবো না।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাবুল গাছের নীচে বসে সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা আল্লাহর নবীর হাতে হাত দিয়ে প্রতীজ্ঞা করেছিলেন, তাঁরা ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। এতে যদি প্রাণ দিতে হয় তবুও তাঁরা প্রস্তুত। হযরত ওমসান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পক্ষ থেকে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই অঙ্গীকার করলেন। অর্থাৎ তিনি নিজের বাম হাতটি ডান হাতের ওপরে রেখে বলেছিলেন, 'এই হাত ওসমানের পক্ষ থেকে রাখা হলো।'

হযরত ওসমানকে বন্দী করার পরে খোদ মক্কাতেই কুরাইশদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো। তাদের মধ্যে অনেকেই বললো, 'তোমরা যদি ওসমানকে মুক্তি না দাও এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ্জ করতে না দাও, তাহলে আমরা তোমাদের সাথে নেই।'

তারপর হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এসে মুসলমানদের সাথে মিলিত হলেন। কুরাইশরা অনেক আলাপ আলোচনার পরে সুহায়েল ইবনে আমরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রেরণ করলো একটি সমাধানে পৌছার জন্য। এই লোকটি ছিল বাক্যবাগিস। তাকে কুরাইশ নেতারা বলে দিয়েছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এ বছর ফিরে যায় তাহলেই কেবল তাঁর সাথে সন্ধি হতে পারে। কেননা, যদি তিনি এ বছর হজ্জ আদায় করে ফিরে যান, তাহলে সারা আরবে ছড়িয়ে পড়বে যে, কুরাইশরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পরাজিত হয়েছে। এটাও ছিল কুরাইশদের বৃথা অহংকার। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে সাহাবায়ে কেরাম অসন্তুষ্ট হবে জেনেও তিনি কুরাইশদের সে অসম্মানজনক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন।

## হোদায়বিয়ার সন্ধি

কুরাইশদের প্রতিনিধি সুহায়েল ইবনে আমর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলোচনা শুরু করলো। দীর্ঘক্ষণ যাবৎ আলোচনা চললো। তারপর উভয় পক্ষের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল, সন্ধির শর্ত নিয়ে। কারণ, এ সমস্ত শর্তের ভেতরে এমন কিছু শর্ত ছিল, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য অবমাননাকর। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম এসব শর্ত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। পক্ষান্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা পেয়েছিলেন, এই অসম্মানজনক শর্তের ভেতরেই ইসলাম

ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তিনি কুরাইশদের এসব শর্ত গ্রহণ করেই সন্ধি স্থাপন করলেন। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সন্ধির বিষয় বস্তু লিখতে বললেন। সে সময় আরবে প্রথা ছিল, কোন কিছু লিখার শুরুতে তারা লিখতো, 'বিইছমিকা আল্লাহুম্মা'। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সন্ধি পত্রের শুরুতেই লিখলেন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'। এই ধরণের লিখার সাথে মক্কার পৌত্তলিকরা অপরিচিত ছিল। কুরাইশদের প্রতিনিধি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লিখা দেখে আপত্তি জানিয়ে বললো, 'বিইছমিকা আল্লাহুম্মা' লিখতে হবে।

আল্লাহর নবী তাদের দাবীই গ্রহণ করলেন। এরপর লিখা হয়েছিল, 'এই চুক্তিনামা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেনে নিয়েছেন।' কুরাইশদের প্রতিনিধি সুহায়েল ইবনে আমর 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শব্দ লিখা দেখে আপত্তি জানিয়ে বললো, 'আমরা যদি আপনাকে রাসূল হিসাবেই স্বীকৃতি দিতাম তহালে তো এত কিছুর প্রয়োজনই হত না। এই 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শব্দ আমরা গ্রহণ করতে পারি না। এখানে লিখতে হবে, 'মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে সুহায়েল! তুমি অবিশ্বাস করছো? আল্লাহর কসম! মহান আল্লাহই আমাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন।'

এ কথা বলে তিনি হযরত আলীকে আদেশ দিলেন, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র পরিবর্তে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখো।'

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শব্দটা তিনি নিজে হাতে মুছে দিবেন! এটা কি সম্ভব! তাঁর শরীরে প্রাণের স্পন্দন থাকা পর্যন্ত 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শব্দ তিনি নিজের হাতে মুছে ফেলতে পারবেন না। বিনয়ে বিগলিত হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মৃদু কণ্ঠে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নাম মুছে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

আল্লাহর নবী তাঁর প্রিয় সাহাবীর মনের অবস্থা অনুভব করলেন। তিনি হযরত আলীকে বললেন, 'কোথায় সেই 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শব্দটি আমাকে দেখিয়ে দাও, আমিই মুছে দিচ্ছি।'

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সন্ধি পত্রের ওপরে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শব্দটির ওপরে নিজের হাতের আঙ্গুল রেখে দেখিয়ে দিলেন। আল্লাহর নবী স্বয়ং তাঁর নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি মুছে দিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কার কুরাইশদের লিখিত সন্ধি হলো। এই সন্ধিকে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত করে তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

(১) চলতি বছর মুসলমানগণ হজ্জ না করেই মদীনায় ফিরে যাবে। দশ বছরের জন্য পরস্পরের ভেতরে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

(২) পরের বছর মুসলমানগণ ইচ্ছা করলে হজ্জ করতে আসতে পারবে। তবে কোন ধরণের অস্ত্র বহন করতে পারবে না। আত্মরক্ষার জন্য মুসলমানগণ যে অস্ত্র বহন করবে, সে অস্ত্রও কোষবদ্ধ থাকবে।

(৩) মুসলমানগণ হজ্জের তিনদিন মক্কায় অবস্থান করবে। এই তিনদিন কুরাইশরা মক্কার বাইরে অবস্থান করবে।

(৪) হজ্জের সময় মুসলমানদের প্রাণ ও সম্পদ নিরাপদে থাকবে। মক্কার ব্যবসায়ীগণ মদীনার পথে নিরাপদে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করবে। তাদেরকে আক্রমন করা যাবে না।

(৫) আরবের যে কোন গোত্র কুরাইশ বা মুসলমানদের সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হতে পারবে। এ ব্যাপারে কোন পক্ষই আপত্তি করতে পারবে না।

(৬) মক্কার কোন লোক তাঁর অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মদীনায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলে তাকে মক্কার কুরাইশদের কাছে প্রত্যার্পণ করতে হবে। কিন্তু মদীনার কোন মুসলিম মক্কায় চলে এলে তাকে প্রত্যার্পণ করা হবে না।

(৭) প্রথম থেকেই যে সমস্ত মুসলমান মক্কায় বাস করছে, তাদেরকে মদীনায় নিয়ে যাওয়া যাবে না এবং মক্কায় যারা থেকে যেতে চায় তাদেরকে বাধা দেয়া যাবে না। সন্ধির শর্ত সকল পক্ষ অনুসরণ করে চলবে।

## নির্যাতনের শিকার হযরত আবু জান্দাল (রাঃ)

একদিকে এই বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই অবমাননাকর সন্ধি, মুসলমানদের মনে ক্ষোভ ধূমায়িত ছিল। যখন সন্ধি লেখার কাজ চলছিল ঠিক সেই মুহূর্তে মুসলমানদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাবার মতই একটি ঘটনা ঘটলো। কুরাইশদের প্রতিনিধি সুহায়েল ইবনে আমর সন্ধি করতে এসেছে। আর তার সন্তান আবু জান্দাল তখন শৃংখলিত অবস্থায় মক্কা থেকে পালিয়ে সন্ধি স্থলে দেহে নির্যাতনের চিহ্ন নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ইতোপূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণে তাঁকে বেঁধে নির্যাতন করা হত। তখন পর্যন্ত তাঁর শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন ছিল স্পষ্ট। তাঁর এই অবস্থা দেখে মুসলমানদের মানের আগুন এবার প্রকাশ্যে জ্বলে উঠলো। হযরত আবু

জান্দাল এসে মুসলমানদেরকে এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন। তিনি মুসলমানদের সামনে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর কাফির পিতা সুহায়েল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, 'হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সন্ধি পালনের সময় উপস্থিত। আমার সন্তানকে আমার কাছে ফেরৎ দেয়া হোক।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এখনো তো চুক্তিপত্র লেখার কাজই শেষ হয়নি।' সুহায়েল বললো, 'তাহলে আমরা এই চুক্তি অনুসরণ করবো না।'

আল্লাহর নবী তাকে বিভিন্নভাবে বুঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে কোন কথাই শুনলো না। তার সন্তান আবু জান্দালের মুখে সে প্রচন্ড আঘাত করলো। হযরত আবু জান্দাল তখন করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে মুসলমানদেরকে বলছিল, 'হে আমার মুসলমান ভাইয়েরা! ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যারা আমার ওপর দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতন চালাচ্ছে, আমাকে পুনরায় তাদের কাছেই ফেরৎ পাঠাচ্ছো?'

তাঁর অবস্থা দেখে মুসলমানদের চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুকের ভেতর যেন তোলপাড় করে উঠলো। তিনি তাঁর হযরত আবু জান্দালকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আবু জান্দাল! ধৈর্য ধারণ করো। তোমাদের মত যাদের অবস্থা তাদের মুক্তির ব্যবস্থা মহান আল্লাহ করে দেবেন। আমরা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে চুক্তি করেছি। এই চুক্তি লংঘন করা যায় না।'

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছুটে গেলেন হযরত আবু জান্দালের কাছে। তিনি তাঁর দিকে কথা বলতে বলতে তরবারী এগিয়ে দিলেন। হযরত ওমর আশা করেছিলেন, আবু জান্দাল তাঁর তরবারী গ্রহণ করে পিতা সুহাইলকে হত্যা করে নিজেকে মুক্ত করবে। কিন্তু হযরত আবু জান্দাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর নবীর কথায় ধৈর্যের পথ অবলম্বন করলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছুটে এলেন। তাঁর মুসলিম ভাইয়ের যন্ত্রণা নিজ চোখে দেখে তিনি যেন কিছুটা ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছিলেন।

আল্লাহর নবীকে তিনি আবেগভরে বললেন, 'আপনি কি সত্যই আল্লাহর রাসূল নন?' আল্লাহর হাবীব শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'হে ওমর! আমি সত্যই আল্লাহর রাসূল।' হযরত ওমর পুনরায় বললেন, 'আমরা কি সত্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই?' তিনি বললেন, 'অবশ্যই আমরা সত্যর ওপর প্রতিষ্ঠিত।'

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, 'আমরা ইসলামের এই অবমাননা কেমন করে বরদাস্ত করবো?'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে ওমর! আমি আল্লাহর রাসূল, তাঁর নির্দেশ ব্যতীত কিছুই করতে পারি না। তিনি অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন।' হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অভিমান সুলভ ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনিই তো বলেছিলেন, আমরা কা'বাঘর তাওয়াফ করবো!'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, 'তবে আমি এ কথা বলিনি যে, এ বছরই আমরা তাওয়াফ করবো।'

হযরত ওমর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে গেলেন। তাঁর কাছেও তিনি একই কথা বললেন। হযরত আবু বকর বললেন, 'হে ওমর! তিনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। তিনি যা কিছু করেন তা আল্লাহর নির্দেশেই করেন।'

এ সময়টি ছিল সাহাবায়ে কেরামের জন্য এক কঠিন পরীক্ষার সময়। এই ধরণের চুক্তি রাসূল কেন করলেন, তা তাদের বোধগম্য হলো না। তারপর আবু জান্দালের করুণ অবস্থা দেখে তাদের মন-মানসিকতা একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়েছিল। রাসূল নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথেই চৌদ্দশত তরবারী প্রস্তুত হয়ে যেত হযরত আবু জান্দালকে মুক্ত করার জন্য। অথচ আল্লাহর নবী তাঁদেরকে সে নির্দেশ না দিয়ে তাঁকে কাফিরদের হাতেই উঠিয়ে দিলেন। কেমন যেন এক অসহনীয় অবস্থার মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম পড়ে গেলেন। তাঁরা আল্লাহর নবীর আদেশ পালন করতেও দেরী করলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আদেশ দিলেন, 'তোমরা যে যেখানে আছো সেখানেই কোরবানী করো।' পরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার আদেশ দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম অবিচল বসে রইলেন। তারপর তিনি উঠে তাঁর তাঁবুর ভেতরে গেলেন। উম্মুল মোমেনিন হযরত উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার কাছে উপস্থিত সমস্যার কথা জানালেন। তিনি আল্লাহর নবীকে পরামর্শ দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাউকে কিছু না বলে বাইরে গিয়ে নিজেই কোরবানী করুন এবং ইহরাম খোলার জন্য নিজের মাথা মুড়িয়ে ফেলুন। তারপর দেখবেন তাঁরা আপনার অনুসরণ করবে।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করলেন। সাহাবায়ে কেরাম এবার বুঝলেন, তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তা অপরিবর্তনীয়। তাঁর সিদ্ধান্তে আর পরিবর্তন আনা হবে না। তখন তাঁরাও আল্লাহর নবীর অনুসরণে কোরবানী করলেন এবং মাথা মুড়িয়ে ফেললেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনদিন হোদায়বিয়াতে অবস্থান করে মদীনার দিকে অগ্রসর হলেন। সাহাবায়ে কেরাম মদীনা থেকে যে আনন্দ এবং উচ্ছ্বাস নিয়ে মক্কার দিকে এসেছিলেন, এখন আর তাঁদের

ভেতরে সে আনন্দের লেশ মাত্র নেই। তার পরিবর্তে তাদের ভেতরে জমা হয়েছে হতাশা আর অভিমান। মনে বড় আশা ছিল, মাতৃভূমি মক্কাতে থাকতে না পারলেও অন্তত দীর্ঘ দিন পরে প্রাণ ভরে মক্কাকে দেখবেন। সে ভাগ্য তো হলোই না, এমন এক ধরণের সন্ধির কাছে নতি স্বীকার করে যেতে হচ্ছে, যে সন্ধি পরাজয়মূলক। ভগ্ন হৃদয়ে তাঁরা মদীনার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আবার সাহাবায়ে কেরামের মনে বিবেকের যন্ত্রণাও ছিল, তাঁরা কি এবার রাসূলের সাথে কোন অসৌজন্যমূলক আচরণ করলেন না তো! বিশেষ করে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিবেকের কষাঘাতে জর্জরিত হচ্ছিলেন।

এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আহবান জানিয়ে মহান আল্লাহর ঘোষনা শুনিয়ে দিলেন। যে কারণে মুসলমানদের মন খারাপ ছিল, আল্লাহ তা'য়ালা সেদিকেই ইঙ্গিত করে জানিয়ে দিলেন– হে রাসূল! আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। ( সূরা ফাতাহ-১-৪)

সমস্ত মুসলমান যে চুক্তিকে স্পষ্ট পরাজয় হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, মহান আল্লাহ সেই চুক্তিকে সুস্পষ্ট বিজয় হিসাবে চিহ্নিত করলেন। তাঁরা অনুভব করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজস্ব মন-মস্তিষ্ক দিয়ে এই চুক্তি করেননি। তাঁকে এ ধরণের চুক্তি করার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ ঘোষনাও দেয়া হলো, সাহাবায়ে কেরাম যে ভুল ত্রুটি করেছেন, মহান আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের মনে যে বেদনার সৃষ্টি হয়েছিল, সে বেদনা তাঁদের ব্যক্তি স্বার্থে হয়নি। ইসলামের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই তাঁদের ভেতরে ক্ষোভের বা বেদনার সৃষ্টি হয়েছিল।

মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষনা আসার পরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অন্তরে শান্তি লাভ করেছিলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন, আমি নিশ্চয়ই রাসূলের সাথে বেয়াদবি করে ফেলেছি। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে কাফফারা আদায় করেন। রোজা রাখেন, নফল নামায আদায় করেন, দান সদকা করতে থাকেন, দাস মুক্ত করেন। এভাবে তিনি তাঁর ব্যবহারের জন্য কাফফারা আদায় করেন। কিছুদিন পরেই সকল সাহাবায়ে কেরাম বুঝলেন, হোদায়বিয়ার সন্ধি ছিল মক্কা বিজয়ের উদ্বোধন।

## হোদায়বিয়া সন্ধি-বিজয়ের সিংহদ্বার

আপাততঃ দৃষ্টিতে হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্র কুরাইশদের স্বার্থের অনুকূলেই সম্পাদিত হয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু দূরদৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এর ফল ছিল সর্বতোভাবে মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে এবং অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এক অসাধারণ রাজনৈতিক প্রতিভা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পবিত্র কোরআন এই সন্ধিকে Evident Victory বা শ্রেষ্ঠ বিজয় হিসাবে উল্লেখ করেছে। এই সন্ধির (Treaty) ফলেই মুসলমানগণ একটি স্বাধীন সার্বভৌম শক্তিরূপে লিখিতভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এই সন্ধির (Treaty) ফলেই ইসলাম চারদিকে বিজয়ী শক্তিরূপে আত্ম প্রকাশ করেছিল। ইসলামের সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব করতে পেরে আরবের জনগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছিল। নবুওয়াত লাভের পর থেকে গত ১৯ বছরের অসীম ত্যাগ আর সাধনার পরে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১৪০০-তে। কিন্তু Treaty of Hudaybiah বা হোদায়বিয়ার সন্ধির মাত্র দুই বছর পরে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১০,০০০-এ।

এ সম্পর্কে ইবনে হিশাম বলেছেন, The result of this treaty is that whereas Muhammad (sm) went forth to Hudaybiah with only 1,400 men, he was followed two years later, in the attack on Makkah, by ten thousand.

অর্থাৎ 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে ১৪০০ শত লোক নিয়ে হোদায়বিয়াতে গিয়েছিলেন, সেখানে মাত্র দুই বছর পরে ১০,০০০ হাজার লোক নিয়ে মক্কায় অভিযান করেন।'

এই সন্ধির ফলে খোজায়া সম্প্রদায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সন্ধি করে কুরাইশরা নিজেরাই নিজেদের জালে বন্দী হয়। তাদের শক্তি দিন দিন ক্ষয় হতে থাকে। আল্লাহর নবীর জীবনী রচয়িতা ইমাম যুহরী বলেন, There was no man of sense and judgment amongst the idolators who not led thereby to join Islam.

অর্থাৎ 'পৌত্তলিকদের মধ্যে এমন কোন বিবেচক ব্যক্তি ছিল না যে, সে ইসলামের ছায়াতলে আসতে প্রলুব্ধ হয়নি।'

পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ হোদায়বিয়া সন্ধিকে Land mark অর্থাৎ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে অভিহিত করেছে।

ইসলামের কার্যক্রম শুরু হবার পর থেকেই মুসলিম এবং অমুসলিমগণ একত্রে মিলেমিশে থাকতো না এবং চলতোও না। এই সন্ধি স্থাপনের ফলে তাদের ভেতর থেকে সমস্ত বাধা দূরিভূত হয়েছিল। উভয় পক্ষ মক্কা-মদীনায় যাতায়াত করতে পারতো। মক্কার অমুসলিমগণ মদীনায় এসে মাসের পরে মাস অবস্থান করতো। মদীনায় তারা নিজেদের বাড়ির পরিবেশেই অবস্থান করতো। ইসলামের বিধি-বিধান নিয়ে তাঁরা মুসলমানদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতো।

মক্কায় তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে ইসলামকে একটি মতাদর্শ হিসাবেই পেয়েছিল। কিন্তু মদীনায় সেই ইসলামকেই জীবন্ত আদর্শ হিসাবে পেয়ে তারা মুগ্ধ হয়ে ইসলাম কবুল করতো। মদীনা থেকে মুসলমানগণ মক্কায় গমন করতো। মুসলমানদের চরিত্রে ইসলামের জীবন্ত রূপ প্ররিস্ফুটিত হতে দেখে বিবেকবান মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হত। এতদিন যারা ছিল অন্ধকারে, হোদায়বিয়ার সন্ধি তাদের সামনে মহাসত্যের আলোক শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিল। আলো দেখে পঙ্গপাল যেমন আলোর দিকে তীব্রবেগে ছুটে এসে আত্মহুতি দান করে, হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে অমুসলিমগণ ইসলামের আলোর দিকে তীব্রবেগে ছুটে এসে মহাসত্যের কাছে আত্মহুতি দান করছিল। তারা নতুন জীবন লাভে ধন্য হচ্ছিল।

সমস্ত ঐতিহাসিক একবাক্যে স্বীকার করেছেন, এই সন্ধির পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত যত সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল, ইতোপূর্বে গত ১৯ বছরে তা গ্রহণ করেনি। সন্ধি চুক্তিতে একটি শর্ত ছিল, কোন মুসলমান পুরুষ মক্কা থেকে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করলে, তাকে মক্কায় ফেরৎ পাঠাতে হবে। সেখানে কোন মহিলার কথা উল্লেখ ছিল না।

এ সময় মহান আল্লাহ তাঁর নবী এবং মুসলমানদেরকে কোরআন অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন, 'যেসব মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসবে তাদেরকে তোমরা কাফিরদের কাছে ফেরৎ দিও না। কোন কাফির নারী মুসলিম পুরুষের জন্য বৈধ নয় এবং কোন কাফির পুরুষ কোন মুসলিম নারীর জন্য বৈধ নয়। কাফির পুরুষগণ তাঁর মুসলিম স্ত্রীর জন্য যা খরচ করেছে, তোমরা তাদেরকে তা প্রদান করো। তারপর সেসব নারীর সাথে তোমরা মোহর আদায় করে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারো। কোন কাফির মহিলাকে তোমরা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ রেখো না।'

মুসলিম নারীদের মধ্যে হযরত উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা (যিনি পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন) মদীনায় চলে এলেন। তাঁকে ফেরৎ নেয়ার জন্য তাঁর দুই ভাই এসে আল্লাহর নবীর কাছে দাবী করলেন, তাদের বোনকে ফেরৎ দেয়ার জন্য। তিনি ফেরৎ দিতে অস্বীকার করলেন। কারণ চুক্তিতে কোন নারীকে ফেরৎ দেয়ার কথা উল্লেখ ছিল না। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁদের স্ত্রী অমুসলিম অবস্থায় মক্কায় ছিল, তাঁরা তাদের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মুসলিম নারীকে গ্রহণ করলেন। মুসলিম নারীগণ তাদের কাফির স্বামীকে ত্যাগ করলেন।

যেসব মুসলমান বাধ্য হয়ে মক্কায় অবস্থান করতেন, তাঁরা মদীনায় আসতে শুরু করলেন। তাঁরা ছিলেন মক্কার কুরাইশ কর্তৃক অত্যাচারিত। হযরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পালিয়ে মদীনায় এলেন। তাঁকে ফেরৎ নেয়ার জন্য মক্কা

থেকে লোক চলে এলো। আল্লাহর নবী চুক্তি মোতাবেক তাঁকে আদেশ করলেন, 'তোমাকে ফিরে যেতে হবে।' হযরত বাসির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রাসূলের কাছে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে তাদের কাছে পুনরায় যেতে বলেন , যারা আমাকে ইসলাম বিরোধী কাজ করতে বাধ্য করবে?'

আল্লাহর নবী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার একটি ব্যবস্থা করে দেবেন।'

হযরত বাসির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মক্কার লোক দু'জনের সাথে ফিরে চললেন। পথিমধ্যে কৌশলে তাদের একজনকে তিনি হত্যা করে পুনরায় রাসূলের কাছে ফিরে এলেন। ইতোমধ্যে মক্কার দু'জনের মধ্যে যে লোকটি জীবিত ছিল, সেও ফিরে এসে রাসূলকে তার সাথীকে হত্যার সংবাদ জানালেন। হযরত বাসির আল্লাহর নবীকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! চুক্তি মোতাবেক আপনি আমাকে ফেরৎ পাঠিয়েছেন। এখন আর এ ব্যাপারে আপনার কোন দায়-দায়িত্ব নেই।'

এরপর হযরত বাসির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আর মদীনায় অবস্থান করলেন না। তিনি মদীনা থেকে বের হয়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় বাস করতে লাগলেন। মক্কার অত্যাচারিত মুসলমানগণ যখন জানতে পারলেন, তাদের যাবার মত একটি স্থান হয়েছে, তখন তাঁরা মক্কা থেকে পালিয়ে হযরত বাসির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা ঈস নামক স্থানে চলে আসতে লাগলেন। এভাবে সেখানে মুসলমানদের একটি বিরাট জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল।

মক্কা থেকে যেসব ব্যবসায়ী কাফেলা সিরিয়া যেতো এবং কুরাইশদের যেসব বাণিজ্য বহর সিরিয়া থেকে আসতো, ঈস নামক এলাকার জনগোষ্ঠী তাদের ওপরে আক্রমন করে সমস্ত সম্পদ ছিনিয়ে নিত। এভাবে তাঁরা গণীমতের সম্পদ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। মক্কার ইসলাম বিরোধিরা এবার সত্যই প্রমাদ গুনলো। এ ব্যাপারে তারা আল্লাহর নবীকেও দায়ী করতে পারছে না, অথচ তাদের জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে– সহ্যও করতে পারছে না। তখন তারা বাধ্য হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এর একটি বিহিত করার জন্য এলো।

আল্লাহর নবীর কাছে তারা আবেদন করলো, চুক্তি থেকে এই কথাগুলো বাদ দিতে হবে, 'মক্কার কোন লোক তাঁর অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করলে তাকে মক্কার কুরাইশদের কাছে প্রত্যার্পণ করতে হবে। কিন্তু মদীনার কোন মুসলিম মক্কায় চলে এলে তাকে প্রত্যার্পণ করা হবে না। প্রথম থেকেই যে সমস্ত মুসলমান মক্কায় বাস করছে, তাদেরকে মদীনায় নিয়ে যাওয়া যাবে না এবং মক্কায় যারা থেকে যেতে চায় তাদেরকে বাধা দেয়া যাবে না।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ কথা গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি ঈস নামক এলাকার মুসলমানদেরকে লিখে জানালেন, তোমরা এবার মদীনায় এসে বসবাস করতে পারো। হযরত বাসির যে সময় আল্লাহর নবীর নির্দেশ পেলেন তখন তিনি এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। নবীর প্রেরীত পত্র পাঠ করে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর একক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ফলে ইসলাম বড় উপকৃত হয়েছিল। হযরত আবু জান্দাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর নামাযে জানাযা আদায় করে এই অকুতোভয় সাহসী সৈনিককে কবরে রেখে আল্লাহর নবীর কাছে সকলকে নিয়ে মদীনায় এলেন। এবার কুরাইশরাও নির্বিঘ্নে তাদের ব্যবসার পথে যাতায়াত করার সুযোগ পেলো। হোদায়বিয়ার সন্ধি এভাবেই মুসলমানদের ভাগ্য খুলে দিয়েছিল।

হোদায়বিয়ার সন্ধির কারণে আরবের অন্যান্য গোত্রের ইসলাম বিরোধিরা একটি দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে অপেক্ষা করছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আদর্শিক কারণে মক্কার কুরাইশদের ওপরে বিজয়ী হতে পারেন তাহলে তারাও ইসলাম গ্রহণ করবে। কুরাইশদের ওপরে বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত তাদের ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা ছিল কুরাইশরা। তখন ইয়াহুদীদের সমস্ত শক্তির কেন্দ্র ছিল খায়বর। এই সন্ধির তিন মাসের মধ্যে খায়বর মুসলমানদের পদতলে এলো। ইয়াহূদীদের সমস্ত শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। বিশাল এলাকা মুসলমানদের পদতলে এসে গেল।

ইয়াহূদীদের সাথে যারা জোট গঠন করেছিল তারা এখন মুসলিম জোটভুক্ত হলো। সে সময় মক্কার কুরাইশরা যেন সম্পূর্ণ একা বা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হলো। মাত্র দুই বছরের ভেতরে গোটা আরব ভু-খন্ডে শক্তির ভারসাম্য এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল যে, ইসলাম বিরোধিদের আর সামান্যতম শক্তি অবশিষ্ট রইলো না।

## মক্কার কলিজার মূল্যবান অংশ

কুরাইশদের মধ্যে সম্মানিত গোষ্ঠীর সন্তান ছিলেন হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তাঁর গোটা বংশই ছিল আরবের সেনা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। অর্থাৎ তিনি এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যারা সবাই সামরিক বাহিনীর লোক ছিল। তাঁর রক্তের মধ্যে মিশ্রিত ছিল সামরিক বাহিনীর সমর কৌশল। হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে মক্কা বিজয়ের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সম্পর্কে কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি হাবশাতেই বাদশাহর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কোন বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি হাবশা থেকে মদীনায় রাসূলের কাছে যাচ্ছিলেন ইসলাম গ্রহণ করার

জন্য। পথে তিনি মদীনা যাত্রী একদল লোককে দেখতে পেলেন। তাদের মধ্যে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে খালিদ! কোন দিকে যাচ্ছো?'

তিনি কোন ধরণের জড়তা ব্যতীতই বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমার দৃঢ় বিশ্বাস মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর কতদিন এভাবে থাকবো। চলো যাই তাঁর কাছে, ইসলাম গ্রহণ করি।'

তারপর তাঁরা মদীনায় আল্লাহর নবীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে প্রথমে হযরত খালিদ ও পরে হযরত আমর ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত খালিদ বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পরে আল্লাহর নবী আমাকে বলেছিলেন, 'আমি তোমার ভেতরে যে যোগ্যতা দেখতাম, তাতে আমি আশাবাদী ছিলাম তুমি একদিন কল্যাণ লাভ করবে।'

হযরত খালিদ ইসলাম গ্রহণ করার পরে তাঁর মধ্যে অতীত ভুলের জন্য অনুশোচনা জাগলো। তিনি আল্লাহর নবীর কাছে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে আমি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যে গোনাহ করেছি, এ কারণে আমার জন্য দোয়া করুন।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ইসলাম অতীতের সমস্ত পাপ মুছে দেয়।'

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, 'আপনার এই কথার ওপরে আমি বাইয়াত করলাম।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, 'আমার আল্লাহ! খালিদ তোমার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যে পাপ করেছে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও!'

ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তিনি ছিলেন মক্কার কুরাইশদের জেনারেল, ইসলাম গ্রহণের পরে মুসলিম হিসাবে তাঁর জীবনের প্রথম যুদ্ধেই ঘটনা চক্রে তাঁকেই জেনারেলের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। মুসলিম হিসাবে তাঁর প্রথম যুদ্ধ ছিল মুতার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র দুই হাজার আর রোমান বাহিনীর সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুদ্ধে পরপর তিনজনের নাম সেনাপতি হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। হযরত যায়িদ, হযরত জাফর ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈন– এই তিনজনের কথা রাসূল এভাবে বলেছিলেন যে, প্রথমজন শাহাদতবরণ করলে দ্বিতীয়জন সেনাপতি হবে। তিনিও শাহাদাতবরণ করলে তৃতীয়জন সেনাপতি হবে। তিনিও শাহাদাতবরণ করলে মুসলমানরা যাকে ইচ্ছা সেনাপতি নিয়োগ করবে।

মুতার যুদ্ধে তিনজন সেনাপতির অধীনে হযরত খালিদ জেনারেলের সমস্ত অহংকার বিসর্জন দিয়ে একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। পরপর

তিনজনই যখন শাহাদাতবরণ করলেন, তখন হযরত সাবিত ইবনে আকরাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যুদ্ধের পতাকা উঠিয়ে নিলেন– যেন মুসলিম বাহিনীর মধ্যে কোন ধরণের বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়।

পতাকা হাতে তিনি হযরত খালিদের কাছে এসে বললেন, 'হে খালিদ! এই পতাকা তুমি ধরো।'

দুই লক্ষের বিরুদ্ধে মাত্র দুই হাজার সৈন্য এবং এই দুই হাজারের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা বেশী। বদর, ওহূদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম এই বাহিনীতে শামিল রয়েছেন। তাদের ওপরে নও মুসলিম খালিদের নেতৃত্ব দেবার যে কোন অধিকার নেই এ কথা হযরত খালিদের থেকে আর কে ভালো বুঝতো! তিনি আপত্তি জানিয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে বললেন, 'অসম্ভব! আমি এ পতাকা গ্রহণ করতে পারি না। আপনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। আপনি বদর-ওহূদে অংশগ্রহণ করেছেন। আপনিই এই পতাকার যোগ্যতম ব্যক্তি।

হযরত সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, 'আমি এই পতাকা তোমার জন্যই উঠিয়ে এনেছি। আমার তুলনায় তোমার মধ্যে সামরিক যোগ্যতা অনেক বেশী। তুমি এ পতাকা ধরো।' এবার হযরত সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মুসলিম বাহিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কি খালিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে রাজি আছো?' সমবেত বাহিনী সম্মতি জানিয়ে বলেছিল, 'অবশ্যই আমরা রাজি আছি।'

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে দুই হাজার মুসলিম বাহিনী দুই লক্ষের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল। তিনি বলেন, 'সেদিনের যুদ্ধে আমার হাতে সাতটি তরবারী ভেঙ্গেছিল। সর্বশেষে একটি ইয়েমেনী তরবারী টিকে ছিল।'

আল্লাহর নবী হযরত খালিদের উপাধি দান করেছিলেন, সাইফুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর তরবারী। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যেমন ছিলেন ইসলামের কট্টর শত্রু, তেমনি ইসলাম গ্রহণ করার পরে হয়েছিলেন ইসলামের পরম বন্ধু।

মক্কায় বিভিন্ন গোত্রের ওপরে বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পিত ছিল এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর গোত্র ছিল মক্কার সেই বিখ্যাত গোত্র, যে গোত্র মক্কার ঝগড়া বিবাদের মিমাংসা করতো। তাঁর গোত্রের নাম ছিল বনী সাহম। মক্কার যে তিনজন লোক ছিল ইসলামের প্রধান শত্রু, হযরত আমর ছিলেন তাদের একজন। তিনিই ইসলাম গ্রহণ করে হলেন ইসলামের মহাসেনা নায়ক, আরবের শ্রেষ্ঠ কৌশলী কূটনীতিক ও মিশরবাসীর মুক্তিদাতা।

মুসলমানদের প্রথম যে দলটি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন, তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য হযরত আমর গিয়েছিলেন। তিনিই অমুসলিম অবস্থায় আবিসিনিয়ার বাদশাহকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। খন্দকের যুদ্ধে এসেই হযরত আমরের ভেতরে ইসলাম সম্পর্কে ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছিল।

তিনি স্বয়ং বলেন, 'ইসলামের আহ্বান সম্পর্কে আমি ভাবতে থাকি। তারপর এক পর্যায়ে আমার কাছে ইসলামের মূল সত্য স্পষ্ট হতে থাকে। তারপর আমি মুসলমানদের বিরোধিতা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। কুরাইশ নেতারা আমার মনের অবস্থা অনুভব করতে পেরে আমার কাছে একজন লোক পাঠিয়েছিল। সে আমার সাথে তর্ক বিতর্ক শুরু করলো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বলতে পারো, আমরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত না রোমান পারসিকরা?'

লোকটি জবাব দিল, 'আমরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।' আমি তাকে পুনরায় প্রশ্ন করলাম, 'সুখ সম্পদ এবং ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারী আমরা না তারা?' লোকটি জবাব দিয়েছিল, 'তারাই সুখ-সম্পদ এবং ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারী।'

আমি তাকে বললাম, 'বর্তমান জীবনের শেষে ইন্তেকালের পরে যদি কোন জীবন থেকে থাকে, তাহলে আমাদের এই সত্য কোন কাজে লাগলো? এই পৃথিবীতে আমাদের সত্য আমাদের দুর্দশা দূর করতে সক্ষম হলো না, তাহলে পরকালে আমাদের কোন কল্যাণ লাভের কোন আশাই নেই। সুতরাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেন, মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন আছে এবং সে জীবনে মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করবে, এ কথা অত্যন্ত যুক্তি সংগত বলেই আমার কাছে মনে হয়।'

তিনি আরো বলেন, 'খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরেই আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের বলেছিলাম, একটি কথা তোমরা জেনে রেখো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচারিত আদর্শ বিজয়ী হবার জন্যই এসেছে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে আমার পরামর্শ হলো, চলো আমরা আবিসিনিয়ায় বাদশাহর দরবারে চলে যাই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বিজয়ী হয় তাহলে আমরা আর ফিরবো না। আমরা আবিসিনিয়ায় বাদশাহর দরবারে চলে গেলাম।'

সেখানে ঘটনার এক পর্যায়ে বাদশাহ তাঁকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বুঝালেন। তাঁর চিন্তার জগতে বিপ্লব ঘটে গেল। তিনি বাদশাহর হাতে হাত রেখেই ইসলামের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলেন। তারপরই তিনি

মদীনার পথে দরবারে নববীতে যাত্রা করলেন। পথে হযরত খালিদের সাথে দেখা এবং কথা হলো। তারপর তাঁরা আল্লাহর নবীর সামনে উপস্থিত হলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'আমাদেরকে দেখেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। তিনি উপস্থিত মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, লাকাদ রামাত কুম মাককাহ বিফালাজাতি আকবাদিহা–মক্কা তার কলিজার মূল্যবান অংশসমূহ তোমাদের প্রতি ছুড়ে দিয়েছে।'

হযরত খালিদ ইসলাম কবুল করে যে কথা বলেছিলেন, হযরত আমরও অনুশোচনা করে একই কথা বললেন। আল্লাহর নবী বললেন, 'ইসলাম অতীতের সমস্ত গোনাহ মুছে দেয় এবং হিজরতও সমস্ত গোনাহ মুছে দেয়।'

আরব উপদ্বীপে অধিকাংশ গোত্র মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কোন কোন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তাদের শতাব্দী সঞ্চিত কুসংস্কার ত্যাগ করতে পারেনি। তাঁরা মূর্তির আখড়া উৎখাত করতে ভয় পাচ্ছিল। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন এলাকার নও মুসলিমদের কাছে সাহাবায়ে কেরামকে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা মূর্তির আখড়া উৎখাত করতে সহযোগিতা করতেন। বনী হুজাইল গোত্রের লোকদের কাছে হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে প্রেরণ করা হলো।

সেখানে বিশাল একটি মূর্তির আখড়া ছিল। নও মুসলিমরা তাঁকে জানালো, এখানের মূর্তি ভাঙ্গা সহজ হবে না। এই মূর্তি নিজেকেই নিজে রক্ষা করতে পারে। হযরত আমর তাদের ঈমানী দুর্বলতা দেখে মৃদু হেসে তাদেরকে বললেন, 'তোমাদের অন্তর থেকে দেখছি এখন পর্যন্ত কুসংস্কার দূর হয়নি। যাদের দেখার ক্ষমতা নেই, শোনার ক্ষমতা নেই, তারা কিভাবে আত্মরক্ষা করবে? এবার দেখো তারা কিভাবে আত্মরক্ষা করে।'

এ কথা বলেই তিনি মূর্তির আখড়া ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। এ দৃশ্য দেখে ঐ গোত্রের লোকজনের ঈমান দৃঢ় এবং শতাব্দী সঞ্চিত কুসংস্কার ক্রমশঃ তাদের মধ্যে থেকে দূরিভূত হলো।

## রাজা-বাদশাহর প্রতি বিশ্বনবীর আহ্বান

হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে মুসলমানদের জন্য শান্তি এবং স্বস্তির একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ শুধুমাত্র আরব ভূখন্ডের জন্য প্রেরণ করেননি। তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল সারা বিশ্বের জন্য। তাঁর দায়িত্ব ছিল সমস্ত মানুষের কাছে মহাসত্যের আহ্বান পৌছে দেয়া। সন্ধির বদলে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজে

লাগালেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের একটি সমাবেশ আহ্বান করে বললেন, 'মহান আল্লাহ্ আমাকে সারা জগতের জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তোমরা আমার পক্ষ থেকে মানুষের কাছে সত্যের আহ্বান পৌঁছে দাও। আল্লাহ তোমাদের ওপর রহমত বর্ষন করবেন। ঈসার অনুসারীদের মত তোমরা আমার বিরুদ্ধাচরণ করো না।'

সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! তারা কিভাবে হযরত ঈসার বিরুদ্ধাচরণ করতো?' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানালেন, 'আমি তোমাদের ওপরে যেভাবে দায়িত্ব প্রদান করি তিনিও সেভাবে তাঁর অনুসারীদের ওপর দায়িত্ব দিতেন। যাকে কাছে কোথাও প্রেরণ করা হত, সে খুবই খুশী হত। আর যাকে দূরে প্রেরণ করা হত, সে খুবই অসন্তুষ্ট হত। এ অবস্থা দেখে ঈসা আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। তারপর তাদেরকে যে দেশে প্রেরণ করা হত, সে সেই দেশের ভাষাভাষী হয়ে যেত।'

অর্থাৎ নিজের আসল দায়িত্ব ভুলে গিয়ে সেই দেশের সভ্যতার সাথে মিশে যেত।

এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন দেশের শাসকদের কাছে ইসলাম গ্রহণের জন্য দূত মারফত বার্তা প্রেরণ করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আরবের বাইরের শাসকদের কাছে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে দূত প্রেরণ করেন, সে সময় মক্কার কুরাইশদের ব্যবসায়ী দল আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া অবস্থান করছিল। বছর কয়েক পূর্বে পারস্য সৈন্যগণ রোমকদের নিয়ন্ত্রণাধীন সিরিয়া আক্রমন করে তাদেরকে পরাজিত করেছিল। তারপর রোম সম্রাট তাদেরকে পরাজিত করে সিরিয়ায় নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। এই উপলক্ষে সে জেরুজালেম ভ্রমণ করছিল। আরব গোত্রগুলোর মধ্যে যে গোত্র রোমানদের শাসনাধীনে ছিল, সে গোত্রের নাম ছিল গাচ্ছানী গোত্র। তাদের রাজধানীর নাম ছিল বসরা।

বসরার অধিপতির নাম ছিল হারিস গাচ্ছানী। হযরত দাহিয়া কলবী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এই হারিস গাচ্ছানীর কাছেই আল্লাহর নবীর পত্র হস্তান্তর করেছিলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পূর্বে রোম সম্রাট একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি তাঁর দরবারের লোকদের কাছে সে স্বপ্ন বলার পরে কেউ তার অর্থ বলতে পারেনি। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর সাম্রাজ্য এমন এক জাতি দখল করেছে, যারা তাঁর ধর্ম অনুসরণ করে না। এ সময়েই তাঁর কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র হারিস গাচ্ছানী প্রেরণ করেছিল। রোম সম্রাট পত্র পাবার পরে নির্দেশ দিলেন, 'আরবের কোন অধিবাসীকে খোঁজ করে নিয়ে এসো।'

আবু সুফিয়ান সঙ্গী-সাথীসহ সে সময় ব্যবসা উপলক্ষে সেখানেই ছিল। তাদেরকে রোম সম্রাটের দরবারে নিয়ে আসা হলো। এ সময় দরবারে দোভাষীও ছিল। তাঁর দরবারে রাষ্ট্রের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা এবং তাঁর ধর্মের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিল। রোম সম্রাট জানতে চাইলো, 'আরবে যে ব্যক্তি নবী হিসাবে নিজেকে দাবী করছে তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী কে আছে?'

আবু সুফিয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি ঐ ব্যক্তির নিকটতম প্রতিবেশী, যে ব্যক্তি নিজেকে নবী হিসাবে দাবী করে।' রোম সম্রাট জানতে চাইলো, 'যে ব্যক্তি নবী হিসাবে দাবী করছে, তাঁর বংশ কেমন?' আবু সুফিয়ান বললো, 'তিনি আমাদের মধ্যে উত্তম বংশের লোক।' রোম সম্রাট প্রশ্ন করলো, 'এই বংশে কি আর কোন ব্যক্তি নবী হিসাবে দাবী করেছিল?' আবু সুফিয়ান জানালো, 'না, এমন দাবী ইতোপূর্বে কোন ব্যক্তি করেনি।'

রোম সম্রাট জানতে চাইলো, 'তাঁর বংশে কি কোন ব্যক্তি রাজা বাদশাহ ছিল?' আবু সুফিয়ান বললো, 'না, কেউ রাজা-বাদশাহ ছিল না।' রোম সম্রাট জিজ্ঞাসা করলো, 'তাঁর আদর্শ যারা গ্রহণ করছে, তাঁরা কি সমাজের উচ্চস্তরের লোক না নিম্ন স্তরের?' আবু সুফিয়ান জবাব দিল, 'সমাজের নিম্ন স্তরের লোকের সংখ্যাই বেশী।' রোম সম্রাট প্রশ্ন করলো, 'তাঁর আদর্শের অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না হ্রাস পাচ্ছে?' আবু সুফিয়ান কুণ্ঠিতভাবে জবাব দিল, 'ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।' রোম সম্রাট জানতে চাইলো, 'তিনি কি কোনদিন মিথ্যা কথা বলেছেন?' আবু সুফিয়ান জানালো, 'না কোনদিন মিথ্যা কথা বলেননি।'

রোম সম্রাট জিজ্ঞাসা করলো, 'তিনি কি কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন?' আবু সুফিয়ান উত্তর দিল, 'না, তিনি কোনদিন কারো সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেননি। তবে তাঁর সাথে আমরা বর্তমানে একটি চুক্তি করেছি। এই চুক্তির ব্যাপারে সে কি করে ভবিষ্যৎই বলে দেবে।' রোম সম্রাট প্রশ্ন করলো, 'তোমরা কি কখনো তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছো?' আবু সুফিয়ান জানালো, 'হ্যাঁ করেছি।' রোম সম্রাট আগ্রহ প্রকাশ করলো, 'যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছে?' আবু সুফিয়ান সত্য স্বীকার করলো, 'কখনো আমরা বিজয়ী হয়েছি কখনো তিনি বিজয়ী হয়েছেন।' রোম সম্রাট সর্বশেষ প্রশ্ন করলো, 'তিনি মানুষকে কোন শিক্ষার দিকে আহ্বান করেন?'

আবু সুফিয়ান জানালো, 'তিনি মানুষকে আহ্বান করেন, তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করো। তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করো না। নামায আদায় করো। সত্য কথা বলো। অঙ্গীকার পালন করো। পবিত্রতা অবলম্বন করো। লুটতরাজ করো না। অন্যের উপকার করো ইত্যাদী।'

আবু সফিয়ান মিথ্যা কথা বলতে পারেনি। কারণ পৌত্তলিক হলেও তাঁর ভেতরে কিছুটা শালিনতা বোধ ছিল। এ ছাড়া তার সাথে মক্কার বেশ কয়েকজন লোক ছিল। সে তাদেরই নেতা। নেতা হয়ে তাদের সামনে সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে পারেনি। আবু সুফিয়ানের কথা শুনে রোম সম্রাট মন্তব্য করেছিল, 'তুমি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যা বললে, সবকিছু শুনে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হলো যে, সে ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহর নবী। তিনি অবশ্যই আমার দেশ জয় করবেন। এখন তিনি আমার কাছে থাকলে আমি তাঁর কদম মোবারক ধুয়ে দিতাম এবং নিজেকে ধন্য করতাম।'

## রোম সম্রাটের কাছে বিশ্বনবীর পত্র মোবারক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি রোম সম্রাটের দুর্বলতা দেখে তাঁর রাজ্যের উচ্চ পদস্থ লোকজন তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করছিল, রোম সম্রাট তা স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছিল। সম্রাটের কথাবার্তা এবং ব্যবহার থেকে প্রকাশ পেয়েছিল তিনি অচিরেই ইসলাম গ্রহণ করবেন। কিন্তু রাজ্য লোভ, পদের লোভ তাকে সত্য গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর মনের জগতে মহাসত্যের যে জ্যোতি উদিত হয়েছিল, লোভের ঘৃণ্য স্পর্শে সে জ্যোতি মুহূর্তেই নির্বাপিত হয়ে গেল।

ইসলাম গ্রহণ করলেই তাঁর রাজ্যের কর্মকর্তাবৃন্দ তাকে আর বর্তমান পদে বহাল রাখবে না বা তাঁর গদি টিকবে না, এই ধারণা তাঁর ভেতরে ছিল বদ্ধমূল। ফলে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হতে সে বঞ্চিত হলো। তবে আল্লাহর নবীর পত্রের প্রতি সে কোন অমর্যাদা প্রদর্শন করেনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে যে পত্র লিখেছিলেন, আমরা তাঁর বাংলা অনুবাদ উল্লেখ করছি।

**বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম**

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে যিনি আল্লাহর বান্দাহ এবং প্রেরিত রাসূল। রোমের সম্রাটের প্রতি যিনি রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। যিনি সত্য গ্রহণের প্রত্যাশী তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং নিরাপত্তা লাভ করুক। আমি তোমাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে নিরাপত্তা পাবে। মহান আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ বিনিময় দিবেন। যদি তুমি সত্য গ্রহণ না করো তাহলে তোমার প্রজাদের যাবতীয় অপরাধের কারণে তুমিই দায়ী হবে। হে গ্রন্থধারীগণ! এসো, আমরা এমন একটি কথার সাথে ঐকমত্য পোষণ করি, যা তোমাদের ও আমাদের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। সে কথাটি হলো, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করবো না। আমরা অন্য কোন শক্তিকে তাঁর সাথে অংশীদার বানাবো না এবং আমরা একে অন্যকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করবো না। তুমি

যদি এসব কথা গ্রহণ না করো, তাহলো সাক্ষী থেকো আমরা এসব কথা গ্রহণ করেছি।' পত্রের শেষে আল্লাহর নবীর পবিত্র নাম মোবারক সীল মোহর করা ছিল। অর্থাৎ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শব্দ সীল মোহর করা ছিল।

কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, সম্রাট এই পত্র তাঁর দেশের প্রধান পুরোহিতের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। পুরোহিত সে পত্র পাঠ করে প্রকাশ্যে ঘোষনা দিয়েছিল, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাঁর ঘোষনা শোনার সাথে সাথেই তাকে তাঁর অনুসারীরা হত্যা করেছিল। সে সময় মহান আল্লাহর নাজিল করা পূর্ববর্তী কিতাবের শিক্ষা কিছুটা ছিল। এর মাধ্যমেই অনেকেই জানতো যে, বর্তমান সময় একজন নবী অবশ্যই আসবেন। তবে এই কিতাবধারিদের ধারণা ছিল, সেই নবী তাদের ভেতর থেকেই প্রকাশিত হবেন। কিন্তু আরবদের মধ্য থেকে নবী হতে দেখে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো হিংসা। এই হিংসাই শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পথভ্রান্ত করেছিল।

## পারস্যের দরবারে বিশ্বনবীর দূত

পারস্যের দরবারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হোজায়ফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু । পারস্যের দরবারের নিয়ম ছিল সম্রাট যতক্ষণ আদেশ না দিতেন, ততক্ষণ কোন ব্যক্তি মাথা উঠাতো না। হযরত আব্দুল্লাহ দরবারে প্রবেশের সময় এই নিয়ম তাঁকে একজন শিখিয়ে দিল। তিনি বললেন, 'আমার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়, কারণ আমরা এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো সম্মুখে মাথানত করি না।'

প্রহরী তাকে জানালো, এই নিয়ম পালন না করলে সম্রাট কারো পত্র গ্রহণ করেন না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হোজায়ফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দরবারে প্রবেশ করলেন। সম্রাট দরবারে প্রবেশ করে সামনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। সবাই মাথা নিচু করে আছে আর একজন লোক মাথা উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গীতে বসে আছে। তিনি লোকটির পরিচয় জানতে চাইলেন। তাকে বলা হলো, লোকটি এসেছে সেই আরব থেকে। আপনার জন্য সে একটি বার্তা এনেছে।

সম্রাট তাঁকে কাছে আসতে বললেন। নবীর সাহাবী কাছে এসে তাকে সালাম জানিয়ে পত্র তার কাছে হস্তান্তর করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্রাটের কাছে লিখেছিলেন–

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মহান আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট খসরুর কাছে। যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করে তাদের প্রতি সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত

আর কেউ দাসত্ব পাবার উপযোগী নয় এবং আমি তাঁর প্রেরিত রাসূল। জীবিত মানুষকে সতর্ক করার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। তোমার প্রতি আমার আহবান, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। তোমার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হবে। যদি না করো তাহলো তোমার শাসিত প্রজাদের যাবতীয় অন্যায় কাজের জন্য তুমি দায়ী হবে।

পত্রের শেষে আল্লাহর নবীর পবিত্র নাম মোবারক সীল মোহর করা ছিল। পারস্যের সম্রাট খসরু ছিল চরম পাপাচারী ব্যক্তি। পৃথিবীর কোন মানুষ তার সমপর্যায়ের হতে পারে, এটা সে মানতো না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পাঠ করার সাথে সাথে সে অহংকারে গর্জে উঠে বললো, 'এতবড় সাহস কার! আরবের সামান্য একজন মানুষ আমাকে বলে আমার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য? তারপরে সে আমার নামের পূর্বে নিজের নাম লিখেছে!'

চরম অহংকারের বশবর্তী হয়ে সে আল্লাহর নবীর পত্র ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেললো। তার ধৃষ্টতার এখানেই শেষ হলো না। ইয়েমেনের গভর্ণর বাজানকে আদেশ দিল, আরবের নবী সেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রেফতার করে তার দরবারে প্রেরণ করা হোক। পারস্য সম্রাটের আদেশ অনুযায়ী বাজান দুইজন রাজ কর্মচারীকে মদীনায় প্রেরণ করলো, আল্লাহর নবীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার জন্য। তারা মদীনায় গিয়ে আল্লাহর নবীএক জানালো, 'আমরা পারস্য সম্রাটের আদেশ অনুসারে আপনাকে গ্রেফতার করতে এসেছি। আপনি স্বেচ্ছায় যদি আমাদের সাথে না যান তাহলে সৈন্য বাহিনী এখানে আসবে।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সমাদর করে মেহমানদারী করলেন। আল্লাহর নবী ও সাহাবায়ে কেরামের ব্যবহার দেখে পারস্য রাজের কর্মচারীবৃন্দ অবাক হয়ে গেল। তারা পুনরায় জানালো, 'আপনি যদি আদেশ অনুসারে উপস্থিত হন, তাহলে ইয়েমেনের গভর্ণর আপনার জন্য সুপারিশ করতে পারেন। আর তা যদি না করেন তাহলে আপনার শহর তিনি মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জানালেন, 'আপনাদের প্রশ্নের জবাব আমি আগামী কাল দেব।'

তাদেরকে রাষ্ট্রীয় মেহমান খানায় রাখা হলো। তারা অবাক হলো, পারস্য সম্রাটের আদেশে মানুষ থরথর করে কাঁপে। অথচ এই মানুষটির ভেতরে কোন ধরণের প্রতিক্রিয়া নেই। পরের দিন তারা আল্লাহর নবীর কাছে এলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জানালেন, 'তোমাদের সম্রাট আর এই

পৃথিবীতে জীবিত নেই। তার সন্তান তাকে গতরাতে নিহত করেছে। তোমাদের গভর্ণর বাজানকে বলবে, পারস্য সম্রাট যেমন আমার পত্রকে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করেছে, মহান আল্লাহ পারস্য সাম্রাজ্যকে তেমনি টুকরা টুকরা করে দেবেন। বাজানকে বলবে, সে যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে তাকে আমি তার পদেই বহাল রাখবো। কারণ, অচিরেই ইসলাম পারস্যের সিংহাসনে বসবে।'

পারস্যের দূতগণ অবাক হয়ে ইয়েমেনে ফিরে গেল। সেখানেই তারা জানতে পারলো, সম্রাট খসরুর সন্তান সিরওয়াহ পিতাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেছে। সে বাজানের কাছে সংবাদ প্রেরণ করেছে, দ্বিতীয় আদেশ না দেয়া পর্যন্ত আরবের সেই নবীর ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। ইয়েমেনের গভর্ণর তার দূতের মুখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সংবাদ শুনলেন। তারপরই সে এবং দরবারের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু কিছুদিন না যেতেই তাঁর মনে এই দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা জেগে উঠেছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল, জীবনের বাকী কয়টি দিন সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে অবস্থান করে কাটিয়ে দেবে। এ কারণে সে গভর্ণরের পদ হতে পদত্যাগ করে মদীনার পথে যাত্রা করেছিল। পথে তিনি এক গুপ্তঘাতকের হাতে শাহাদাতবরণ করেন।

আবিসিনিয়ার দরবারেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূত প্রেরণ করেছিলেন। ইতোপূর্বেই সেখানের বাদশাহ ইসলামের অনুকূলে সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর নবীর জন্য প্রচুর উপঢৌকনসহ তাঁর সন্তানকে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু পানি পথে জাহাজ ডুবিতে তাঁরা সবাই শাহাদাতবরণ করেছিলেন। আবিসিনিয়ার বাদশাহর প্রচেষ্টায় ইসলাম অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এই বাদশাহর ইন্তেকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেছিলেন বলে কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে।

## মিশর ও চীনে তাওহীদের ধ্বনি

হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে আর কিছু দিনের ভেতরেই কা'বাঘর- যে ঘর হবে ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র-সেই তাওহীদের ধ্বনি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে। ইসলাম একটি প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি হিসাবে গোটা বিশ্বের বাতিল শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এ কারণেই বোধহয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ব থেকেই রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানের ব্যবস্থা করেছিলেন। মিশরের শাসক মুকাউকিস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূতকে খুবই সম্মান-মর্যাদা দিয়েছিলেন।

আল্লাহর নবীর পবিত্র পত্র বাহক হযরত হাতিব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য প্রচুর উপঢৌকন দিয়েছিলেন। তিনিই হযরত মারিয়া কিবতিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে আল্লাহর নবীর খেদমতে প্রেরণ করেছিলেন। পরবর্তীতে সেই নারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি নবীর সন্তানের মাতা হবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যদিও সে সন্তান শিশু কালেই ইন্তেকাল করেছিলেন। মিশরের শাসক মুকাউকিস আল্লাহর নবীর দূত ও পত্রের প্রতি যে সম্মান-মর্যাদা দেখিয়ে ছিলেন, সে কারণেই বোধহয় তাঁর সম্মান মহান আল্লাহ এতটা বৃদ্ধি করেছেন যে, বিশ্বনবীর জীবনী যারাই পাঠ করে, তাঁরাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়।

রোম সম্রাট যে কারণে ইসলাম গ্রহণ করতে পারেননি, সেই একই কারণে বোধহয় মিশর শাসক মুকাউকিস ইসলাম গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু আল্লাহর নবীর প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। ইসলামের সাথে তিনি বন্ধুর মতই আচরণ করেছেন।

বিশ্বনবীর দূত দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। যারা ইসলামের আহ্বান নিয়ে আল্লাহর নবীর পক্ষ থেকে দূরদুরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল, মানুষের মাঝে ইসলামের আলো বিতরণ করার জন্য তাদের মধ্যে অসীম আগ্রহ ছিল। বিপদ সংকুল পথের দুর্ভাবনায় তাদের উৎসাহ এতটুকু হ্রাস পায়নি। আর হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের অনুসারীরা তাঁর সাথে বিদ্রোহ করেছে। সত্যের আলো বিতরণ করার জন্য দূরে কোথাও যেতে বললে তারা অস্বীকার করেছে। মহান আল্লাহ তাঁর নবীর সাহাবায়ে কেরামের ওপর রহমত নাজিল করুন।

সে সময় বাহরায়েন ছিল পারস্য সম্রাটের আশ্রিত রাজ্য। বাহারায়েনের গভর্ণর ছিলেন মুনজার ইবনে সাভী। তিনি অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর কাছে নবীর দূত পৌঁছার সাথে সাথেই তিনি এবং তাঁর অধিকাংশ প্রজা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজ্যের ইয়াহূদী এবং অগ্নি পূজকরা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। বাহরায়েনের গভর্ণর তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত মারফত জানতে চাইলেন, 'ইয়াহূদী আর অগ্নি পূজকদের ব্যাপারে আপনি যে সিদ্ধান্ত দিবেন, আমি তাই কার্যকর করবো।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দূত মারফত জানালেন, 'ধর্মের ব্যাপারে কারো ওপরে শক্তি প্রয়োগ করা ইসলাম হারাম করেছে। কেউ যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তার ওপরে শক্তি প্রয়োগ করা যাবে না। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ আল্লাহর নবীর পত্রের কথা ইয়াহূদী আর অগ্নি পূজকরা জানতে পেরে

মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ওমান প্রদেশ শাসন করতো জাফর এবং আবদ নামক দুই ভাই। তাদের কাছে গিয়েছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ইসলামের সামরিক বাহিনীর বিখ্যাত জেনারেল আরবের শ্রেষ্ঠ কুটনীতিবীদ হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু । তিনি তাদের কাছে আল্লাহর নবীর পত্র দিয়েছিলেন। তাঁরা পত্র পাঠ করে বেশ কয়েকদিন চিন্তা ভাবনা করে শেষে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলামের মশাল হাতে যে সব সাহাবা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। আরবের প্রায় সমস্ত গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করেছিল অথবা ইসলামের মিত্রে পরিণত হয়েছিল। হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের ভেতরে ইসলাম একটি আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুমাতুল জান্দালের লোকজন যেন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। ইসলামের আহ্বান লাভ করার সাথে সাথেই তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। হিময়ার জাতির লোকজন তাদের শাসক জুলকেলাকে ভগবানের আসনে বসিয়েছিল। ইসলামের আহ্বান শোনার সাথে সাথেই স্বয়ং জুলকেলা ভগবানের আসন থেকে নেমে এসে বিশ্বনবীর দাসত্ব বরণ করেছিল। ইসলাম গ্রহণ উপলক্ষে সে ১৮,০০০ হাজার দাস দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছিল।

আল্লাহর নবী বলেছিলেন, পারস্য সম্রাট যেমন নবীর পত্র ছিঁড়ে টুকরা করেছিল, তাঁর সাম্রাজ্য তেমনই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ইসলাম পারস্যের সিংহাসনের ওপর বসবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শাসনামলে গোটা পারস্য ইসলামের ছায়াতলে এসেছিল। ডক্টর আল্লামা ইকবাল সত্যই বলেছেন, 'কালিমায়ে তাইয়েবার আওয়াজ এমনি এক আওয়াজ ছিল, যে আওয়াজে গোটা আরব ভু-খন্ড ওলট পালট হয়ে ইউরোপ আফ্রীকাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল।'

হাবশার বাদশাহ দুটো জাহাজে করে হযরত আবু ওয়াক্কাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নেতৃত্বে একদল মুসলমানকে চীনে প্রেরণ করেছিলেন। তখন চীনের শাসক ছিলেন সম্রাট এ্যাংডি। তাঁর কাছে মুসলমানদের দল ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে সম্মান শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং ইসলাম গ্রহণ না করলেও তাদেরকে চীনে ইসলাম প্রচার করার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম সেখানে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নিজের উদ্যোগেই চীনে ইসলাম প্রচারক দল প্রেরণ করেছিলেন, এ কারণেই বোধহয় আল্লাহর নবী পৃথকভাবে চীনে কোন দল প্রেরণ করেননি। চীনে সাহাবায়ে কেরাম এসে ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, চীনের কোয়াংটাং মসজিদ

সেদিনের সাক্ষী হয়ে আজও নিজের গৌরব ঘোষনা করছে। সাহাবায়ে কেরামই সে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ইসলামের নাম শুনলে যারা সাম্প্রদায়িকতা আর সন্ত্রাসের গন্ধ পায়, তাদের জেনে রাখা উচিত– ইসলাম তরবারী বা শক্তি প্রয়োগ করে অথবা ষড়যন্ত্রের পথ ধরেও আসেনি। কোন জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইসলাম তাদের ঘাড়ের ওপরে পুঁজিবাদ আর সমাজবাদের মত চেপে বসেনি। ইতিহাস সাক্ষী, ইসলাম আপন মহিমার গুণেই সর্বস্তরের মানুষের অন্তর জয় করেছিল।

## খায়বরের যুদ্ধ

খায়বরের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল ১৬০০ শত। মাত্র ২০০ সৈন্য ছিল অশ্বারোহী আর সবাই পদাতিক। এই যুদ্ধে আল্লাহর নবী তিনটি বিশাল পতাকা নির্মাণ করেছিলেন। মুসলিম বাহিনী এই যুদ্ধে প্রথমে এমন এক স্থানে শিবির স্থাপন করেছিল, যে স্থান ছিল খায়বর এবং গাতফান গোত্রের মাঝে। কারণ গাতফান গোত্র ইয়াহূদীদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল। মুসলিম বাহিনীর একটি দল এই স্থানেই রয়ে গেল এবং আরেকটি দল খায়বরের দিকে এগিয়ে গেল। অর্থাৎ মুসলমানদের সামনেও শত্রু পেছনেও শত্রু। গাতফান গোত্র যখন জানতে পারলো, মুসলিম বাহিনী খায়বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চুক্তি মোতাবেক ইয়াহূদীদেরকে সাহায্য করার জন্য বের হলো। তারপরই তারা যখন দেখলো, তাদের গোত্রের পাশে মুসলিম বাহিনীর শিবির, ভয়ে তাদের কলিজা যেন কণ্ঠনালির কাছে চলে এলো। ইয়াহূদীদের সাহায্য করা দূরে থাক, নিজেদের গোত্রকে বাঁচানোর চেষ্টাতেই তারা হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

খায়বরে বিশাল আকৃতির ছয়টি দূর্গ ছিল এবং এসব দুর্গে প্রায় বিশহাজার সৈন্য ছিল। সবচেয়ে সুরক্ষিত দুর্গ ছিল কামুস দূর্গ। মদীনা থেকে বহিষ্কৃত ইয়াহূদীরা এই দুর্গেই বাস করতো। এই দুর্গের অধিপতি ছিল মারহাব নামক এক বিখ্যাত বীর। তদানীন্তন আরবে যাকে এক হাজার যোদ্ধার সাথে তুলনা করা হত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। পথে আসরের নামাযের সময় হলে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তিনি নামায আদায় করে আহার পর্ব সারলেন। খাদ্য বলতে এ সময় মুসলমানদের কাছে ছিল যবের ছাতু। আল্লাহর নবী এই ছাতু পানিতে মিশিয়ে আহার করেছিলেন।

রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরে পৌছলেন। সেখানে পৌছে তিনি দোয়া করলেন, 'আমার আল্লাহ! আপনার কাছে এই এলাকার, এলাকাবাসীর এবং এলাকার সমস্ত বিষয়ের কল্যাণ কামনা করছি ও এসবের অনিষ্টকারীতা হতে আপনার কাছে পানাহ চাইছি।'

তিনি যে কোন নতুন এলাকায় পৌঁছলেই এই দোয়া করতেন। তিনি রাতে কাউকে আক্রমন করতে দিতেন না। এ কারণে রাতে সেখানে অবস্থান করে তিনি সকালে খায়বর দুর্গের কাছে উপনিত হলেন। এখানে পৌঁছেও আল্লাহর নবী আপোসের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কুচক্রি ইয়াহুদীদের দল যুদ্ধ ব্যতীত কোন কিছুই গ্রহণ করেনি। ইয়াহুদীদের উস্কানীর মুখে মুসলিম বাহিনী প্রথমে একটি দুর্গের ওপরে আক্রমন করলো। কিছুক্ষণের ভেতরেই সে দুর্গ মুসলমানরা দখল করে নিল।

এভাবে প্রায় দুর্গই মুসলমানদের দখলে চলে এসেছিল। কিন্তু কামুস দুর্গ দখল করা গেল না। এই দুর্গেই অবস্থান করছিল তাদের বিখ্যাত বীর মারহাব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সেনাপতি করে এই কামুস দুর্গ জয় করার জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি জয় করতে পারলেন না। আল্লাহর নবী এবার প্রেরণ করলেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে। তিনিও পারলেন না। আল্লাহর নবী ঘোষণা করলেন, 'আমি আগামী কাল এমন একজনের হাতে পতাকা অর্পণ করবো, মহান আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করবেন। সেই ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ঘোষনা সাহাবায়ে কেরামের ভেতরে এক অস্থির অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। কে সেই সৌভগ্যবান ব্যক্তি, যাকে স্বয়ং আল্লাহ ভালোবাসেন এবং তাঁর রাসূলও ভালোবাসেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর সারা জীবনে কোনদিন পদের জন্য সামান্যতম আশা পোষণ করেননি। কিন্তু খায়বরের দিন তিনি নিজেকে সুস্থির রাখতে পারেননি। কারণ আল্লাহর নবী আগামী কাল যাকে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করবেন, তাঁকে আল্লাহ ভালেবাসেন। এই পদের লোভ কি ত্যাগ করা যায়! এ কারণে তিনি ঐ পদের লোভ করেছিলেন।

পরের দিন সকালে আল্লাহর নবী সকল জল্পনা কল্পনার অবসান করে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নাম ঘোষনা করলেন। সাহাবায়ে কেরামের কাছে হযরত আলীর নামটা অপ্রত্যাশিত ছিল। কারণ, তাঁরা জানতেন হযরত আলী চোখের পীড়ায় অসুস্থ। এ অবস্থায় তাঁকে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করা এক অসম্ভব ব্যাপার। অসুস্থ হযরত আলীকে ডেকে আনা হলো। আল্লাহর নবী তাঁর চোখে পবিত্র মুখের লালা দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীর হাতে পতাকা উঠিয়ে দিলেন। হযরত আলী বললেন, 'দুর্গের ইয়াহুদীদেরকে মুসলমান বানিয়ে ছাড়বো।'
আল্লাহর রাসূল তাঁকে বললেন, 'তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করবে। তাদের একজনও যদি তোমার প্রচেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সেটা মূল্যবান হিসাবে বিবেচিত হবে।'

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যুদ্ধে গেলেন। আরবের বিখ্যাত বীর মারহাব যুদ্ধ বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি করতে করতে দুর্গ থেকে বের হলো। তার মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ এবং তার ওপরে পাথরের খোল। তার সাথে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হলো। এক পর্যায়ে হযরত আলী আল্লাহু আকবর বলে গর্জন করে মারহাবের মাথার ওপরে আল্লাহর নবীর দেয়া তরবারীর আঘাত করলেন। হাদীস এবং ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, সে আঘাতে মারহাবের মাথার শিরস্ত্রাণের ওপরের পাথর দু'ভাগ হয়ে শিরস্ত্রাণ দু'ভাগ হলো, তারপর তার মাথা দু'ভাগ হয়ে মুখের দাঁত পর্যন্ত তরবারী পৌঁছে গেল।

খায়বরে প্রায় ২০ দিন ইয়াহূদীদের অবরোধ করে রাখার পরে মুসলমানগণ বিজয়ী হয়েছিল। প্রতিপক্ষের ৯৩ জন নিহত হয়েছিল আর মুসলমানদের শাহাদাতবরণ করেছিল ১৫ জন। করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন খায়বর বিজয় করে মদীনায় এলেন, সেদিনই হযরত আলীর বড় ভাই হযরত আবু জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় ফিরে এলেন। আল্লাহর নবী তাঁকে দেখে এত খুশী হয়েছিলেন যে, তিনি এগিয়ে গিয়ে হযরত আবু জাফরের কপালে চুমু দিলেন। মুসলমানগণ একত্রে দুটো কারণে খুশী হলেন। একদিকে খায়বর বিজয় আরেকদিকে হযরত জাফরের প্রত্যাবর্তন।

## মূতার যুদ্ধ

সিরিয়ার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় রোম সম্রাটের অধিনে বেশ কয়েকজন নেতা শাসন কাজ পরিচালনা করতো। বালক্কা এলাকায় যে নেতা শাসন করতো তার নাম ছিল শোরহাবিল। আল্লাহর নবীর দূত হারিস ইবনে ওমায়ের নবীর পত্র নিয়ে তার কাছে গিয়েছিলেন। বর্তমানেই শুধু নয়, সে সময়েও দূত হত্যা করা সমস্ত দেশেই নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু শোরহাবিল আন্তর্জাতিক সকল রীতি নীতি ভঙ্গ করে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের দূতকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল।

এই ঘটনার কিসাস হিসাবে আল্লাহর নবী তিনহাজারের এক মুসলিম বাহিনী সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। রোম সম্রাট নবীর পত্র পেয়ে সাময়িকের জন্য ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছিল বটে, কিন্তু বৈষয়িক স্বার্থের কারণে ইসলামের কঠিন শত্রুর ভূমিকায় সে অবতীর্ণ হয়েছিল। তার অধিনস্থ নেতা শোরহাবিলকে মদীনা আক্রমনের উৎসাহ সেই দিয়েছিল। উদিয়মান ইসলামী শক্তিকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। কারণ তার বেশ কয়েকটি মিত্র রাষ্ট্র ইসলামের প্রতি ছিল সহানুভূতিশীল। অনেকে ইসলাম কবুল করেছিল। তার সাম্রাজ্য কখন ইসলামের শক্তির কাছে নত হয়ে যায়, এই ভয়েই সে ছিল কম্পমান।

তার শাসনাধীন সিরিয়ার মায়ান প্রদেশের গভর্ণর ফারোয়া ইতোমধ্যেই ইসলাম কবুল করেছিল। ফারোয়াকে সে তার দরবারে ডেকে নিয়ে প্রথমে নানা ধরণের ভয়ভীতি দেখালো ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় খৃষ্টান হবার জন্য। তিনি ইসলাম ত্যাগ করলেন না। তারপর তাকে প্রলোভন দেখানো হলো। তবুও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তারপর তাঁকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছিল। ভয় পেয়ে গিয়েছিল রোম সম্রাট হোরাক্লিয়াস। তার শাসনাধীন এলাকার নেতারা যদি ইসলাম কবুল করতে থাকে, তাহলে তো তার সাম্রাজ্যই টিকবে না। সুতরাং শোরহাবিলকে সে লাগিয়ে দিল, সৈন্য বাহিনী যা প্রয়োজন আমার কাছে থেকে গ্রহণ করো, তবুও মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রকে উৎখাত করতেই হবে।

বিশ্বনবী এবার ভিন্ন ধরণের ব্যাবস্থাধীনে ইসলামের সেনাবহিনী প্রেরণ করেছিলেন। মাত্র তিন হাজার সেনা সদস্য। সবাই তাওহীদের অনুসারী। এক সময়ের ক্রীতদাস, যাকে আল্লাহর নবী নিজের সন্তানের সতই দেখতেন। সেই শিশুকাল থেকেই তিনি নবীর সাহচর্যে রয়েছেন। তিনি হলেন হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু । তাঁকেই এই বাহিনীর প্রথম সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। প্রতিটি যুদ্ধেই একজন করে সেনাবাহিনী নিযুক্ত করা হত। এই যুদ্ধে পরপর তিনজন সেনাবাহিনী নিযুক্ত করলেন। বিষয়টা ছিল অন্য যুদ্ধের তুলনায় একটু ব্যতিক্রম ধর্মী। দ্বিতীয় প্রধান করা হলো হযরত জাফর ইবনে আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে। তৃতীয় প্রধান করা হলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘোষনা করলেন, 'যায়িদ শাহাদাতবরণ করলে দায়িত্ব গ্রহণ করবে জাফর, জাফর শাহাদাতবরণ করলে দায়িত্ব গ্রহণ করবে আব্দুল্লাহ। সেও যদি শাহাদাতবরণ করে তাহলে মুসলিম বাহিনী যাকে ইচ্ছা তাকে সেনবাহিনী প্রধান নিযুক্ত করবে।'

সেনাবাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে, আল্লাহর নবী সাথে সাথেই যাচ্ছেন। তিনি সেনা প্রধানকে বললেন, 'প্রথমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাবে, যদি তারা ইসলাম কবুল করে তাহলে যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা অগ্রসর হবে ঐ পর্যন্ত যেখানে হারিস তাঁর মহান কর্তব্য পালন করার সময় শাহাদাতবরণ করেছে।'

মুসলিম বাহিনী মদীনা হতে বের হয়েছে–এ সংবাদ গুপ্তচর মাধ্যমে শোরহাবিল জানতে পেরে এক লক্ষ সৈন্যর এক বাহিনী প্রস্তুত করলো। রোম সম্রাট এবং আরব গোত্রগুলোর ভেতর থেকে আরো প্রায় এক লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত রাখলো। প্রথম এক লক্ষ ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় এক লক্ষের দলকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয়া হবে।

মুসলিম বাহিনী সিরিয়া প্রদেশে উপনিত হয়ে জানতে পারলো, তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য শোরহাবিল এক লক্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে এবং আরো এক লক্ষ সৈন্য তাদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। মুসলিম বাহিনী সেখানেই যাত্রা বিরতি করে নিজেদের ভেতরে আলোচনায় বসলেন। সেনাপতি হযরত যায়িদ বললেন, 'এ অবস্থায় সামনের দিকে আর অগ্রসর না হয়ে এখানেই অবস্থান করা উচিত। মদীনায় সংবাদ প্রেরণ করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি।'

শাহাদাতের আকাংখায় উদ্দিপ্ত মুসলিম বাহিনী তাদের সেনাপতির কথায় সন্তুষ্ট হলেন না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বললেন, 'আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতবরণ করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। শাহাদাতের মধ্যেই রয়েছে জীবনে পরম সাফল্য। শাহাদাত আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত হিসাবেই এসে থাকে। এই নিয়ামত সবার ভাগ্যে নছিব হয় না। আর সংখ্যা বিচারে মুসলমানগণ বিজয়ের আশা করে না। বিজয় দানের মালিক মহান আল্লাহ।'

হযরত আব্দুল্লাহর তেজোদৃপ্ত কথা শুনে মুসলিম বাহিনীর ভেতরে শাহাদাতের অদম্য কামনা তীব্র হয়ে উঠলো। তাঁরা বীর দর্পে সামনের দিকেই এগিয়ে গেলেন। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হযরত যায়িদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দক্ষতার সাথে সৈন্য বিন্যাস করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে এক সময় তিনি শাহাদাতের সুধা পান করলেন। এরপর হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পতাকা হাতে উঠিয়ে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একলক্ষ এক বাহিনীর সাথে মাত্র তিন হাজার সৈন্যর এক অসম যুদ্ধ হচ্ছে। ময়দানের অবস্থা তখন ভয়ংকর। হযরত জাফরের ঘোড়া আহত হলো।

তিনি পদাতিক অবস্থায় যুদ্ধ করতে লাগলেন। শত্রু পক্ষ তাঁর বাম হাত কেটে ফেলে দিলে তিনি ডান হাতে পতাকা তুলে ধরলেন। ডান হাত কেটে ফেললে তিনি কাটা বাহু দিয়ে পতাকা উড্ডিন রাখলেন। শত্রু পক্ষ তাঁকে শহীদ করে ফেললো। এবার এগিয়ে এলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু । প্রচন্ড বেগে সে সময়ে যুদ্ধ চলছে। তরবারী চালনা করতে করতে তিনি বেশ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। একজন সাহাবী তাঁকে একটুকরা গোস্ত দিয়ে বললেন, 'আপনি বড় ক্ষুধার্ত, এই টুকু খেয়ে তরবারী চালনা করুন।'

গোস্তের টুকরা তিনি মুখে দিয়েছেন। এমন সময় তিনি দেখলেন, একজন মুসলিম সৈন্য বড় বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। তিনি গোস্তের টুকরা ফেলে দিয়ে বললেন, 'এ পৃথিবীর খাবারের কোন প্রয়োজন আর নেই।'

ছুটে গেলেন তিনি রণাঙ্গনে। এক সময় তিনিও শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। মুতার যুদ্ধে তিনজন সেনাপতির অধীনে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

জেনারেলের সমস্ত অহংকার বিসর্জন দিয়ে একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। পরপর তিনজনই যখন শাহাদাতবরণ করলেন, তখন হযরত সাবিত ইবনে আকরাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যুদ্ধের পতাকা উঠিয়ে নিলেন, যেন মুসলিম বাহিনীর ভেতরে কোন ধরণের বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়।

পতাকা হাতে তিনি ছুটে এলেন হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কাছে। তিনি বললেন, 'হে খালিদ! এই পতাকা তুমি ধরো।'

দুই লক্ষের বিরুদ্ধে মাত্র দুই হাজার সৈন্য। যাদের ভেতরে প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা বেশী। বদর, ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণ এই বাহিনীতে শামিল রয়েছেন। তাদের ওপরে নও মুসলিম খালিদের যে নেতৃত্ব দেবার কোন অধিকার নেই এ কথা হযরত খালিদের থেকে আর কে ভালো বুঝতো! তিনি আপত্তি জানিয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে বললেন, 'অসম্ভব! আমি এ পতাকা গ্রহণ করতে পারি না। আপনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। আপনি বদর ওহুদে অংশগ্রহণ করেছেন। আপনিই এই পতাকার যোগ্যতম ব্যক্তি।

হযরত সাবিত বললেন, 'আমি এই পতাকা তোমার জন্যই উঠিয়ে এনেছি। আমার থেকে তোমার সামরিক দিক দিয়ে যোগ্যতা অধিক। তুমি এ পতাকা ধরো।'

এবার হযরত সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মুসলিম বাহিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কি খালিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে রাজি আছো?' সমবেত বাহিনী সম্মতি জানিয়ে বলেছিল, 'অবশ্যই আমরা রাজি আছি।' হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে দুই হাজার মুসলিম বাহিনী দুই লক্ষের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'সেদিনের যুদ্ধে আমার হাতে সাতখানা তরবারী ভেঙ্গেছিল। সর্বশেষে একটি ইয়েমেনী তরবারী টিকে ছিল।'

## মক্কা অভিযান-বিজয়ীর বেশে বিশ্বনবী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলেন। তাঁর এই অভিযানের এই প্রস্তুতি অত্যন্ত গোপনে হচ্ছিল। মক্কার ইসলাম বিরোধিরা যেন জানতে না পারে, এ কারণেই গোপনীয়তার প্রয়োজন ছিল। আল্লাহর নবী তাঁর পরিকল্পনার কথা কাউকে জানালেন না। যুদ্ধ বা রক্তপাত ছিল তাঁর পবিত্র স্বভাবের বাইরে। তিনি তাঁর পবিত্র অন্তর থেকে কামনা করতেন, মক্কা বিজয় যেন কোন ধরণের রক্তপাত ব্যতীতই হয়ে যায়। তিনি জানতেন, মক্কাবাসী তাঁর সাথে শত্রুতা করলেও তারা তাঁর পরম আপনজন। তারা বোঝেনা, সত্য চিনেনা, না বুঝে তাঁর সাথে শত্রুতা করে। সুতরাং কোন ধরণের যুদ্ধ ব্যতীতই তিনি মক্কা জয়ের আশা পোষন করছিলেন।

গোপন পরিকল্পনার ভিত্তিতে তিনি অগ্রসর হতে থাকলেন। মিত্র গোত্রদের প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল, কিন্তু কেন কি উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হতে বলা হলো, তারা তা জানতে পারলেন না। এমনকি হযরত আয়েশাও জানতেন না, আল্লাহর নবী কোনদিকে যাবেন। শত্রু পক্ষের গুপ্তচরদের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি বিশাল এক বাহিনী প্রস্তুত করলেন। সমস্ত বাহিনী মদীনায় একত্রিত করে মদীনা থেকে সবাই একত্রে যাত্রা করবেন, ব্যাপার এমন ছিল না। পথে যেন তারা আল্লাহর নবীর সাথে নিজের গোত্রের পতাকা আর বাহিনী নিয়ে মিলিত হয়, তিনি এমন ব্যবস্থা করলেন। কোন অভিযানের ব্যাপারে সাধারণত তিনি এত গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন না।

মদীনা থেকে কেউ বের হয়ে মক্কার দিকে যাবে, এমন পথসমূহে তিনি প্রহরা বসালেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কুলসুমকে দায়িত্ব দিলেন, আল্লাহর নবী মদীনায় অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি যেন মদীনার শাসকের দায়িত্ব পালন করেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অষ্টম হিজরী সনের রমজান মাসের দশ তারিখে মদীনা থেকে মক্কা অভিযানে বের হলেন। তিনি এমন বর্ণাঢ্য অবস্থায় কোন অভিযানেই বের হননি। এই অভিযানে তিনি এমন সুসজ্জিত অবস্থায় বের হলেন, যেন ইসলামের শত্রুদের কলিজায় কাঁপন ধরে। দশ হাজার সুসজ্জিত বাহিনী আল্লাহর রাসূলের সাথে। তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁর মাতৃভূমির দিকে। যেখান থেকে একদিন তিনি অশ্রু বিসর্জন দিয়ে বের হয়ে এসেছিলেন। কা'বাঘরের দিকে তাকিয়ে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'হে কা'বা! তোর নিষ্ঠুর সন্তানরা আমাকে থাকতে দিল না।'

আল্লাহর নবী বিশাল এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। এবার আর জনমানবহীন প্রান্তর দিয়ে নয়, জনপদ দিয়েই তিনি তাওহীদের বিজয় কেতন উড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিটি জনপদ থেকেই পতাকাসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আল্লাহর রাসূলের সাথে যোগ দিচ্ছে। বিশাল এক জনসমুদ্র তরঙ্গের ওপরে তরঙ্গ সৃষ্টি করে মক্কার দিকে প্রবল বেগে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন গোত্রের দু'একজন তখন পর্যন্ত ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষন করতো, তারা চক্ষু বিস্ফারিত করে তাওহীদের এই তরঙ্গ দেখছে।

আল্লাহর নবী রাতের অন্ধকারে মক্কা থেকে অনতিদূরে মাররুজ জাহরান নামক এলাকায় এসে উপনিত হলেন। সেখানেই তিনি যাত্রা বিরতি করে সৈন্যবাহিনীকে শিবির স্থাপন করতে আদেশ দিলেন। হাজার হাজার তাঁবু স্থাপন করা হলো। তিনি আদেশ দিলেন, প্রতিটি তাঁবুতেই যেন পৃথকভাবে রান্নার আয়োজন করা হয়। এ কারণে প্রতিটি তাঁবুতেই পৃথকভাবে চুলা জ্বালানোর প্রয়োজন হলো। ক্ষণিকের ভেতরেই হাজার হাজার চুলা জ্বলে উঠলো।

রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে বিশাল প্রান্তর আলোকিত হয়ে উঠলো। সে আলোয় মক্কা নগরী যেন উদ্ভাসিত হয়ে গেল। ভয়ে ইসলাম বিরোধিদের কলিজা যেন কন্ঠনালী দিয়ে বের হয়ে আসার উপক্রম হলো। বিশ্বনবী রাতের অন্ধকারে অধিক সংখ্যক চুলা জ্বালানোর যে আদেশ দিলেন, এর পেছনে ছিল সামরিক কৌশল। ইসলামের শত্রুগণ যেন ধারণা করে, লক্ষ লক্ষ বাহিনী মক্কার দিকে এগিয়ে আসছে। ঘটেছিলও তাই, কুরাইশরা দেখতো যেন লক্ষ লক্ষ চুলা জ্বলছে। চুলার সংখ্যা যখন নিরূপণ করা যাচ্ছে না, তাহলে সৈন্যর সংখ্যা নিশ্চয়ই লাখ কয়েক হবে।

চরম আতংকে তাদের নিশ্বাস যেন বন্ধ হবার উপক্রমন হলো। তারা বিশ্বনবীর বাহিনীর সঠিক সংখ্যা জানার জন্য হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার ভাইয়ের সন্তান হাকিম ইবনে হিজাম, বুদাইল ইবনে ওরাকা ও তাদের নেতা স্বয়ং আবু সুফিয়ানকে প্রেরণ করলো। তারা ছদ্মবেশে মুসলিম বাহিনীর দিকে এগিয়ে এলো প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য। ওদিকে আল্লাহর নবীর চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করলেও তিনি মক্কাতেই অবস্থান করতেন। তিনি যেদিন পরিবার পরিজন নিয়ে মদীনার দিকে হিজরত করলেন, সেদিনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে মক্কা অভিযানে বের হলেন। পথে চাচা ভাতিজার সাক্ষাৎ হলো। তিনিও মক্কা অভিযানে শামিল হলেন।

হযরত আব্বাস ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, যদি এমন কাউকে পেতেন তাহলে তার কাছে সংবাদ প্রেরণ করতেন, সে যেন মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের কাছে বলে, যথা সময়ে এসে আল্লাহর নবীর কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেদের নিরাপত্তা কামনা করে। হযরত আব্বাস বিশ্বনবীর সাদা খচ্চড়ে চড়ে অনুসন্ধান করছিলেন। এমন সময় তাঁর সাথে মক্কার আবু সুফিয়ানের দেখা হয়ে গেল। হযরত আব্বাস তাকে বললেন, 'দেখতে পাচ্ছো তো, আল্লাহর রাসূল বিশাল এক বাহিনী নিয়ে এসেছেন। মক্কার কুরাইশরা এবার ধূলার সাথে মিশে যাবে।'

আবু সুফিয়ান ব্যগ্র কণ্ঠে হযরত আব্বাসকে বললেন, 'আমার মা-বাপ তোমার জন্য কোরবান হোক! এই অবস্থায় কি করতে হবে আমাকে বলে দাও।'

তিনি বললেন, 'তোমাকে দেখতে পেলে নিশ্চয়ই মুসলিম বাহিনী মাথা কেটে নেবে এতে সন্দেহ নেই। তুমি আমার এই খচ্চড়ের পেছনে উঠে বসো। আল্লাহর রাসূলের কাছে চলো। আমি তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' মক্কার কুরাইশ নোত আবু সুফিয়ান, যার দাপটে রণভূমি কেঁপে উঠেছে। সেই নেতা আজ নিজের প্রাণের মায়ায় কোন কথা না বলে রাসূলের চাচার পেছনে উঠে বসলো। হযরত আব্বাস খচ্চর ছুটিয়ে আল্লাহর নবীর দিকে যেথে থাকলেন। হযরত ওমর আগুনের যে চুলা

জ্বালিয়ে ছিলেন, তার পাশ দিয়েই হযরত আব্বাস যাচ্ছিলেন। হযরত ওমর তাকে দেখে ফেললেন। তিনি বলে উঠলেন, 'আল্লাহর শোকর যে, তিনি তাঁর দুশমনকে আমাদের ভেতরে এনে দিয়েছেন।'

কিন্তু তাকে হত্যা করতে হলে আল্লাহর রাসূলের অনুমতি প্রয়োজন, এ কারণে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দ্রুত উঠে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিকে ছুটলেন। হযরত আব্বাস খচ্চর ছুটিয়ে আল্লাহর নবীর কাছে উপস্থিত হয়ে আবু সুফিয়ানের প্রাণ ভিক্ষার আবেদন করলেন। হযরত ওমরও তাকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। বিশ্বনবী কোন পক্ষেই সাড়া দিলেন না। হযরত আব্বাস হযরত ওমরকে বললেন, 'হে ওমর! এই লোক যদি তোমার কবিলার হত তাহলে কি তুমি এতটা কঠোর হতে পারতে?'

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, 'আপনি এমন করে বলবেন না। আপনি যেদিন ইসলাম কবুল করেছিলেন, সেদিন আমি যা আনন্দিত হয়েছিলাম আমার পিতা খাত্তাব ইসলাম কবুল করলেও এতটা আনন্দিত হতাম না।'

এই সেই আবু সুফিয়ান, যার নেতৃত্বে বিশ্বনবীর প্রিয় চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে হত্যা করে তাঁর বুক চিরে কলিজা বের করে চিবিয়ে ছিল আবু সুফিয়ানেরই স্ত্রী হিন্দা। স্বয়ং আবু সুফিয়ান হযরত হামজার পবিত্র দেহে বর্শার আঘাত করে নানা কথা বলেছিল। তার অতীত কর্ম তৎপরতা সমস্ত মুসলমানের সামনে ছিল স্পষ্ট। অজস্র অপরাধে সে অপরাধী। তাঁর প্রতিটি অপরাধই ছিল মৃত্যুদন্ডের যোগ্য। কিন্তু যার সামনে সে দাঁড়িয়ে ছিল নতমস্তকে, তিনি ছিলেন রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন। করুণার মূর্ত প্রতীক হিসাবে যিনি পৃথিবীতে আগমন করেছেন। আল্লাহর নবী আবু সুফিয়ানের কানের কাছে মুখ নিয়ে অভয় দান করলেন, 'কোন ভয় নেই, এটা ভয়ের জায়গা নয়।'

ঐতিহাসিক আত তাবারী বলেন, আবু সুফিয়ানের সাথে আল্লাহর নবীর কিছু কথা হয়েছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাস করেছিলেন, 'হে আবু সুফিয়ান! এখনো কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই?' আবু সুফিয়ান বলেছিল, 'আজ যদি অন্য কোন ইলাহ থাকতো, তাহলে তো আমাদের কাজেই আসতো।'

আল্লাহর নবী তাকে জিজ্ঞাস করেছিলেন, 'আমি যে আল্লাহর রাসূল এতে কি তোমার সন্দেহ আছে?' সে জবাব দিয়েছিল, 'সামান্য একটু সন্দেহ আছে।'

শেষ পর্যন্ত আবু সুফিয়ান ইসলাম কবুল করেছিল। আল্লাহর নবী তাঁকে মর্যাদা দিয়েছিলেন। সে এক সময় প্রকৃত ঈমানদার হয়েছিল। ইসলামের পক্ষে সে যুদ্ধেও গমন করেছে। তায়েফের যুদ্ধে তাঁর একটা চোখ আহত হয়েছিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধে

সে চোখ সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোন বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর নবীর কাছে সুপারিশ করেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আপনি যদি আজ তাকে অনুগ্রহ না করেন তাহলে তার মর্যাদা থাকে না।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'অবশ্যই আমি আজ তাকে মর্যাদা দিবো।' তারপর তিনি আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তুমি মক্কায় গিয়ে ঘোষনা করে দাও, যে ব্যক্তি অস্ত্র ত্যাগ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। যে ব্যক্তি কা'বায় আশ্রয় লাভ করবে, সে নিরাপত্তা লাভ করবে। যে ব্যক্তি নিজের গৃহের দরজা বন্ধ রাখবে, সে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়িতে থাকবে, তারাও নিরাপত্তা লাভ করবে।'

তদানীন্তন আরবে কারো বাড়িকে নিরাপত্তার স্থল হিসাবে ঘোষনা দেয়ার অর্থ ছিল, তাকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করা। আল্লাহর নবী আবু সুফিয়ানের ক্ষেত্রে তাই করেছিলেন। আবু সুফিয়ান মক্কায় গিয়ে আল্লাহর নবীর ঘোষনা জানালেন। তাঁর ঘোষনা শুনে মক্কার কুরাইশরা হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। তিনি আরো ঘোষনা দিলেন, 'আজ থেকে আমি তোমাদের আর নেতা নই, আমার পরিচয় শোন, আমি মুসলমান।'

তাওহীদের সেনাবাহিনী মক্কার দিকে অগ্রসর হতে থাকলো। আল্লাহর নবী তাঁর প্রিয় চাচা হযরত আব্বাসকে বললেন, 'আবু সুফিয়ানকে উচ্চস্থানে দাঁড় করিয়ে দাও, তাওহীদের সেনাবাহিনীর রূপ চেহারা সে দেখুক।'

বিশ্বনবী সৈনিকদের নিয়ে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করছেন, কুরাইশরা ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লো। কেউ আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করলো, কেউ কা'বাঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কয়েকজন মক্কা ত্যাগ করে পালিয়ে গেল। হযরত আব্বাস নওমুসলিম আবু সুফিয়ানকে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। তাওহীদের বিশাল বাহিনী সমুদ্রের তরঙ্গের মতই মক্কা নগরীতে আছড়ে পড়লো।

এক বিস্ময়কর দৃশ্যের অবতারণা হলো। আরবের বিভিন্ন গোত্র তাদের নিজের গোত্রের পতাকা উড়িয়ে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করছে। তাঁরা আল্লাহু আকবর শ্লোগানে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে আল্লাহর সৈনিকরা বীর দর্পে কুজকাওয়াজ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। সর্ব প্রথম গিফারী গোত্রের মিছিল সামনের দিকে এগিয়ে গেল। তার পেছনে জুবায়না গোত্র। মহান আল্লাহ হোদায়বিয়া সন্ধিকে 'ফতহুম মুবিন' অর্থাৎ প্রকাশ্য বিজয় বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আজ তার বাস্তব অবস্থা মানুষ দেখতে পাচ্ছে। এরপর বিভিন্ন গোত্রের মিছিল বজ্রকণ্ঠে তাওহীদের শ্লোগানে মক্কা নগরীকে প্রকম্পিত করে এগিয়ে গেল।

নওমুসলিম আবু সুফিয়ান এসব জান্নাতি দৃশ্য দেখতে দেখতে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিশ্বনবীর চাচা হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু । কারণ সেদিন তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। তিনি চিনতে পারছিলেন না, কোনটা কোন বাহিনী। হযরত আব্বাসকে বিভিন্ন বাহিনীর পরিচয় তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন। এগিয়ে এলো বিশাল এক মিছিল নিয়ে সেনাপতি হযরত সায়াদ ইবনে উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু । আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই বিশাল বর্ণাঢ্য বাহিনী আবার কোন বাহিনী?' হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, 'এই বাহিনী মদীনার আনসারদের বাহিনী।'

হযরত উবায়দা দেখলেন আবু সুফিয়ান দাঁড়িয়ে আছেন হযরত আব্বাসের সাথে। তাকে দেখে তিনি বললেন, 'হে আবু সুফিয়ান! আজকের দিন রক্তপাতের দিন। কা'বাকে আজ উন্মুক্ত এবং বৈধ করে দেয়া হবে।'

অর্থাৎ আজ কা'বা এলাকায় রক্তপাত করা বৈধ। সুফিয়ান বুঝলেন, আজ মক্কা নগরীতে রক্তের প্লাবন বইয়ে দেয়া হবে। তিনি শংকিত হয়ে পড়লেন। তাহলে তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং মক্কার অধিবাসীরা কেউ আজ জীবিত থাকবে না? এমন সময় তিনি দেখলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে পরিবেষ্টন করে সাহাবায়ে কেরাম মিছিল করে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করছেন। এই মিছিলের পতাকা ছিল হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর হাতে।

আবু সুফিয়ান উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি শুনেছেন , উবায়দা কি বলে গেল!' আল্লাহর রাসূল জানতে চাইলেন, 'কি বলেছে উবায়দা?' আবু সুফিয়ান জানালেন, 'উবায়দা বলে গেল আজকের দিন রক্তপাতের দিন। কা'বাকে আজ উন্মুক্ত এবং বৈধ করে দেয়া হবে।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অভয় দান করে বললেন, 'উবায়দা ভুল বলেছে। আজ কা'বা শরীফের মর্যাদা দানের দিন।' অর্থাৎ কোন রক্তপাত নয়, কা'বাঘরের প্রকৃত যে মর্যাদা, আজ সেই মর্যাদা দানের দিন।

এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন, 'উবায়দার হাত থেকে পতাকা নিয়ে তা যেন তাঁরই সন্তানের হাতে দেয়া হয়। পবিত্র মক্কা নগরীতে এক পথ ধরে মিছিল প্রবেশ করেনি। বিভিন্ন পথ ধরে মিছিল প্রবেশ করছিল। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নেতৃত্বে একটা বিশাল মিছিল নগরীতে প্রবেশ করছিল।

বোখারী শরীফে এসেছে বিজয়ী বীর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, যাকে এই নগরীর লোকজন কতই না অত্যাচার করেছে। নামাযে দাঁড়ালে মাথার ওপর পশুর পচা নাড়ি ভুড়ি চাপিয়ে দিয়েছে। নবী মাথা উঠাতে পারেননি। শিশু ফতেমা

পিতার এই করুণ অবস্থা দেখে কেঁদেছেন আর হাহাকার করেছেন। নবীকে পথে বের হতে দেয়নি। তাঁকে পাগল বলে ঢিল ছুড়েছে। রান্না করতে দেয়নি। রান্নার হাড়িতে আবর্জনা নিক্ষেপ করেছে। এত অত্যাচার যারা করেছে, তাদের ভেতরে তিনি বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করছেন।

অথচ তাঁর চেহারায় গর্ব অহংকারের কোন চিহ্ন নেই। তাঁর সমস্ত আচরণে ক্ষমা আর মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছে। সুললিত কণ্ঠে তিনি ঐ সূরা ফাত্হ্ তিলওয়াত করছেন। যে সূরায় বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় নাজিল হয়েছিল। ইসলাম তরবারীর শক্তিতে আসেনি। এই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ইসলাম কোন শক্তির বিনিময়ে বিজয়ী হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহর রাসূলকে উটের ওপর বসে মিষ্টি কণ্ঠে সূরা ফাত্হ্ পাঠ করতে দেখেছি। হযরত মুআবিয়া ইবনে কুররা বলেন, যদি আমার পাশে লোকজন ভীড় করার আশংকা না থাকতো, তাহলে মুগাফ্ফালের মত আমিও রাসূলের কোরআন তিলওয়াত শুনতাম। (বোখারী)

আল্লাহর নবীর নির্দেশ ছিল, কোন ধরণের বাধা না এলে কারো প্রতি আঘাত করা যাবে না। কিন্তু কুরাইশদের একটা হঠকারী দল হযরত খালেদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মিছিলের ওপর আক্রমন করে বসলো। তিনজন সাহাবা শাহাদাতবরণ করলেন। বাধ্য হয়ে হযরত খালেদ হামলা করলেন। কুরাইশদের বিভ্রান্ত দলের ১৩ জন নিহত হলো। আল্লাহর নবী দূর থেকে যুদ্ধের দৃশ্য দেখে হযরত খালেদকে তলব করলেন। কৈফিয়ত চাইলেন, কেন যুদ্ধ শুরু করা হলো। তিনি জানালেন, প্রতিপক্ষ তাদের ওপরে প্রথমে আক্রমন করে তিনজনকে শহীদ করে দিয়েছে। তখন আল্লাহর নবী বললেন ,'আল্লাহর ইচ্ছা এমনই ছিল।'

বিশ্বনবীর পতাকা হাজুন নামক স্থানে বসানো হলো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আজ কোথায় থাকবেন? আপনি কি আপনার সেই পুরোনো বাড়িতেই থাকবেন?' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আকীল কি কোন জায়গা রেখেছে!' তারপর তিনি বললেন, 'ঈমানদার ব্যক্তি কাফেরদের উত্তরাধিকারী হয় না। আর কাফেরও ঈমানদারের উত্তরাধিকারী হয় না। (বোখারী)

ইসলামী আইনে কোন মুসলমান কোন অমুসলিমের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না। আল্লাহর নবীর চাচা আবু তালিব যখন ইন্তেকাল করেছিলেন, সে সময় হযরত আলীর ভাই আকীল অমুসলিম ছিলেন। তিনি আল্লাহর নবীর এবং তাঁর পিতার সমস্ত সম্পদ আবু সুফিয়ানের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। বিশ্বনবী কা'বার

ঐ স্থানে অবস্থানের কথা বললেন, যেখানে ইসলাম বিরোধিরা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য একত্রিত হয়ে শপথ গ্রহণ করতো। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় মক্কার উচ্চ এলাকা কাদা নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি যে উটে বসেছিলেন, তাঁর পেছনে বসেছিলেন মূতার যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত হযরত যায়িদ ইবনে হারিসার সন্তান হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম। বিশ্বনবীর পবিত্র মাথা মোবারকে এ সময় ছিল লোহার শিরস্ত্রাণ। আল্লাহর নবী বিজয়ী হতে যাচ্ছেন। এ কারণে তিনি উটের ওপরে মহান আল্লাহর কাছে এতই কৃতজ্ঞশীল ছিলেন যে, তিনি মাথা নীচু করেছিলেন। তাঁর পবিত্র মাথা এতটাই নীচু হয়েছিল যে, তাঁর পবিত্র দাড়ি মোবারক উটের শরীরের সাথে স্পর্শ করছিলো।

আহা! ঐ বিলালের ওপরে কি নিষ্ঠুর নির্যাতনই না করেছে মক্কার নিষ্ঠুর কাফেররা। তাঁর পবিত্র শরীরের গোস্ত আর রক্ত মক্কার পথে প্রান্তরে ছিটকে পড়েছে। তিনিও নবীর সাথে আছেন। কিন্তু তাঁর মনেও নেই কোন প্রতিশোধের সামান্যতম ইচ্ছা। সাহাবায়ে কেরামের চোখে মুখে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন। গোটা বিশ্বের কোন নেতা বা কোন বিজয়ী বাহিনীর এমন কোন ইতিহাস নেই, তারা বিজিত এলাকায় ক্ষমা আর করুণার মালা নিয়ে প্রবেশ করেছে। শুধু মাত্র ব্যতিক্রম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অনুসারীরা। ক্ষমা আর করুণার সাগরে প্রাণের শত্রুও অবগাহন করেছে।

## প্রতীমা মুক্ত কা'বা

পৃথিবীর বুকে পবিত্র কা'বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অংশীবাদীর অমানিশা দূর করার লক্ষ্যে। কিন্তু সেই কা'বাতেই অংশীবাদীর আখড়া স্থাপন করা হয়েছিল। মূর্তির কালিমা লেপন করা হয়েছিল পবিত্র কা'বায়। মুসলিম বাহিনী মক্কায় প্রাবেশ করে বিশ্বনবীর আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন, সিপাহসালার কখন নির্দেশ দিবেন, পবিত্র কা'বাকে মূর্তিমুক্ত করো।

বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বনবী কা'বাঘরের আঙ্গিনায় উট থেকে অবতরণ করেন। তারপর ওসমান ইবনে তালহাকে কা'বাঘরের চাবী আনতে বললেন.। চাবী দিয়ে আল্লাহর ঘর খোলা হলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি উচ্চ কণ্ঠে তাকবির দিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত বিলাল, হযরত উসামা ও হযরত ওসমান ইবনে তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈন।

তিনি দীর্ঘক্ষণ কা'বার ভেতরে অবস্থান করলেন। সে সময় কা'বার ভেতরে এবং তার চার পাশে ৩৬০ টি মূর্তি ছিল। আল্লাহর নবী তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোকে

আঘাত করছিলেন আর বলছিলেন, সত্যের আগমন ঘটেছে মিথ্যা পলায়ন করেছে। সত্য এসেছে বাতিল আর আসবে না।' পবিত্র কা'বা দীর্ঘ দিন পরে কালিমা মুক্ত হলো। সমস্ত মূর্তি ধূলিস্মাৎ করে দেয়া হলো। এই কা'বায় প্রাণহীন পাষাণ প্রতীমার পূজা হয়েছে শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরে। আজ সেখানে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বজ্রকণ্ঠে তাওহীদের বিপ্লবী বাণী দিকদিগন্ত মুখরিত করে তুললো। আল্লাহর নবী সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পবিত্র কা'বায় মহান আল্লাহর কুদরতী পদপ্রান্তে সিজদা করলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কা'বায় প্রবেশ করে কা'বার দেয়ালে যত দেবদেবীর ছবি ছিল তা মুছে দিলেন।

## আজ প্রতিশোধের দিন নয়

এক সময় যারা ছিলেন জালিম অত্যাচারী তাদের আঙ্গিনায় করুণার সিন্ধু প্রবাহিত হলো। যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য তাঁর ঘর পরিবেষ্টন করেছিল, তারাও আজ সেই করুণার সাগরে অবগাহন করার সুযোগ লাভ করলো। তিনি জুম্মা নামায আদায় করলেন। মক্কার শত্রু মিত্র সবাই এসেছে তাঁর পবিত্র মুখের ঘোষনা শুনতে।

তিনি ঘোষনা করলেন, 'এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি একক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আজ তিনি তাঁর অঙ্গিকার পূর্ণ করেছেন। তিনি তাঁর গোলামকে সাহায্য করেছেন এবং সত্যের শত্রুদেরকে স্তব্ধ করেছেন। সমস্ত অহংকার এবং পূর্বের সমস্ত রক্তের বদলা, সমস্ত রক্তের বাঁধন সবই আমার পায়ের নীচে দলিত হলো। কেবল মাত্র কা'বাগৃহের যারা অভিভাবক এবং যারা হাজীদেরকে পানি পান করায় তাঁরা ব্যতিক্রম। হে কুরাইশ গোত্র! অন্ধকার যুগের অমানিশা এবং বংশের অহংকার, সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহ নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। সমস্ত মানুষ আদম থেকে সৃষ্টি এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্টি।

আরবে একটা ঘৃণ্য প্রথা শতাব্দী ব্যাপী প্রতিষ্ঠিত ছিল, কোন ব্যক্তি যদি নিহত হত, তাহলে তার গোত্রের লোকজন মনে করতো যে, হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীকে যদি তারা ধরতে না পারতো, তাহলে তার নাম পরিচয় তারা লিখে রাখতো। ক্ষেত্র বিশেষে তারা প্রতীজ্ঞা করতো, হত্যাকারীর মাথার খুলিতে তারা মদ পান করবে। বংশের লোকদেরকে তারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করে যেত। আরবদের বিশ্বাস ছিল, কেউ কাউকে হত্যা করলে সেই হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে নিহত ব্যক্তির আত্মা সাদা রংয়ের পাখি হয়ে পাহাড়-পর্বতে উড়তে থাকে আর বলতে থাকে, 'আমাকে পান করাও! আমাকে পান করাও!' আবার কারো ধারণা ছিল, যে ব্যক্তি নিহত হয় তার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ

করলে সে ঐ জগতে জীবিত থাকে। আর প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে ঐ জগতে সে মরে যায়। আবার কারো ধারণা ছিল, হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে নিহত ব্যক্তির কবর অন্ধকারে ছেয়ে থাকে। প্রতিশোধ গ্রহণ করা হলে তার কবর আলোকিত হয়। এই সমস্ত অমূলক বিশ্বাসের কারণে যুদ্ধের আগুন কখনো নির্বাপিত হয়নি। এভাবে যুদ্ধ করা বা প্রতিশোধ গ্রহণ করা ছিল তাদের কাছে এক সম্মানজনক ব্যাপার। আল্লাহর নবী আরবের এ ধরণের অহংকার, যাবতীয় কুসংস্কার এবং অন্যায় সম্পর্কে ঘোষনা করলেন, 'আজ এসব কিছুই আমার পায়ের নীচে কবর দিয়ে দিলাম।'

তিনি আরো ঘোষনা করলেন, 'সমস্ত মানুষ আদম থেকে সৃষ্টি এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্টি।' অর্থাৎ কোন ভেদাভেদ নেই। সবাই এক ও অবিচ্ছিন্ন। কেউ কারো ওপরে শ্রেষ্ঠ দাবী করতে পারবে না। তবে ঐ ব্যক্তি হবে বেশী সম্মানিত এবং মর্যাদাবান, যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী পরহেজগার। আল্লাহকে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী ভয় করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষনের সমাপ্তিতে সামনে বিশাল জনসমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তিনি দেখলেন, ঐ লোকগুলো তাঁর মুখের দিকে আজ অসহায়ের মতই তাকিয়ে আছে। তাদের চোখের ভাষায় ফুটে উঠেছে অসহায়ত্ব আর ক্ষমার আকুতি।

নির্যতিত আল্লাহর নবী দেখছেন, ঐ তো-ঐ লোকগুলোর সাথেই তারা মিলে মিশে আজ একাকার হয়ে তাঁর সামনে বসে আছে, যে লোকগুলোকে সত্য গ্রহণের অপরাধে তারা জ্বলন্ত আগুনের ওপরে চিৎ করে শুইয়ে বুকের ওপর পাথর চাপা দিয়েছে। হযররত বিলালের গলায় রশি বেঁধে কাঁটা ও পাথরের ওপর দিয়ে টেনে হিচ্‌ড়ে নিয়ে গেছে, বিলালের শরীরের গোস্ত চামড়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। খাব্বাবের শরীরে এখনো সে ক্ষত দগদগ করছে। শিয়াবে আবু তালিবে দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতে বাধ্য করেছে। ঐ তো সেই লোকগুলো। অনাহারের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তাঁর প্রিয় খাদিজা ঐ যে ভেঙ্গে পড়লেন, তাঁর আশ্রয়দাতা চাচা আবু তালিব ঐ যে ভেঙ্গে পড়লেন, আর উঠতে পারলেন না। আবু জাহিলের সাথে মিলে সুমাইয়াকে যারা হত্যা করেছিল, তারাও তো বসে আছে।

তাঁর প্রিয় চাচা হামজার কলিজা যারা চিবিয়ে ছিল, তারাও আছে। তাঁর গর্ভবতী মেয়ে যয়নবকে আঘাত করে উটের ওপর থেকে নীচে ফেলে দিয়ে গর্ভের সন্তানকে হত্যা করেছিল, তারাও বসে আছে। তাঁকে যারা সীমাহীন কষ্ট দিয়েছে তারাও মাথা নীচু করে বসে আছে। তাঁকে যারা হত্যা করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল, তাঁর সেই প্রাণের শত্রুও অবনত মস্তকে বসে আছে। বদর, ওহুদ ও খন্দকে যারা রক্তের বন্যা

বইয়ে দিয়েছিল, তারাও তাঁর সামনে বসে আছে। তিনি গম্ভির কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের কি জানা আছে, আজ আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো তা কি তোমরা জানো?' এক সময়ের বিরোধিগণ সমস্বরে বলে উঠলো, 'আপনি আমাদের সম্মানিত ভাই, আমাদের মর্যাদাবান ভাতিজা!'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘোষনা করলেন, 'আজ আমার কোন অভিযোগ তোমাদের বিরুদ্ধে নেই। আজ তোমরা সবাই মুক্ত।'

## রাসূলের পাগড়ী মোবারক-নিরাপত্তার প্রতীক

মক্কা থেকে ইসলাম গ্রহণ করার পরে অত্যাচারিত হয়ে যারা মদীনায় হিজরত করেছিলেন, তাদের সমস্ত সম্পত্তি মক্কার ইসলাম বিরোধী লোকজন দখল করেছিল। সাহাবায়ে কেরাম ইচ্ছে করলে তাদের কষ্টার্জিত সে সব বাড়ি ঘর সহায় সম্পদ অধিকার করতে পারতেন। বিশ্বনবী সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ দিলেন, 'তোমরা কোন কিছুতেই হাত দেবে না।'

সাহাবায়ে কেরাম তাদের সম্পত্তির দিকে ফিরেও তাকালেন না। ইতোমধ্যে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কা'বা ঘরের ছাদে আরোহণ করে আযান দিলেন। সে সময় এমন কিছু লোকজন উপস্থিত ছিল, যারা ছিল একেবারে মূর্খ শ্রেণীর এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এদের অন্তরে তাওহীদের আলো প্রবেশ করে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সময়ের প্রয়োজন ছিল। হযরত বিলালের কণ্ঠে তাওহীদের ঘোষনা শুনে আত্তাব ইবনে উসাইদ বললো, 'খোদা আমার পিতার সম্মান রক্ষা করেছে, সে এই আযানের শব্দ শোনার আগেই পৃথিবী ত্যাগ করেছে।'

কোন এক মূর্খ বলেছিল, 'কা'বা ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দিচ্ছে ! এখন তো আমাদের জীবিত থাকাই উচিত না।'

মক্কার জনগণ যা ভেবেছিল, তার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার লাভ করেছিল মুসলমানদের কাছ থেকে। ইসলামের প্রতি তাদের এতদিনের বিদ্বেষ অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল। ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কারো প্রতি সামান্য শক্তিও প্রয়োগ করা হয়নি। তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করার জন্য পাগল পারা হয়ে উঠেছিল। আল্লাহর নবী সাফা পর্বতের একটা উঁচ্চ স্থানে উপবেশন করলেন। মানুষের জোয়ার সৃষ্টি হলো বিশ্বনবীর সামনে। ঘোষনা করে দেয়া হলো, প্রথমে পুরুষদের ইসলাম গ্রহণ শেষ হলে মহিলাগণ আগমন করবে।

পুরুষগণ আগমন করে আল্লাহর নবীর হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করতেন। আর মহিলাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করা হলো, আল্লাহর নবী একটা পানির পাত্রে নিজের পবিত্র হাত মোবারক ডুবিয়ে উঠিয়ে নিতেন। তারপর মহিলাগণ সে পানির

পাত্রে তাদের হাত ডুবাতেন। এভাবে নারীদের বাইয়াত গ্রহণ করলেন। নারীগণ ইসলামের আদেশ নিষেধ পালন করবে, তাদের চরিত্র ভালো রাখবে, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, এ সমস্ত কথার ওপরে তাদের বাইয়াত গ্রহণ করা হয়েছিল।'

ইতিহাসে যে মহিলাকে কলিজা ভক্ষণকারিণী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সে মহিলার নাম হিন্দা। মক্কার নেতা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী সে। পর্দা আবৃতা হয়ে এই নারী আল্লাহর নবীর সামনে এসেছিল। কারণ সে যে অপরাধ করেছিল তার গুরুত্ব সে অনুধাবন করতে পেরেছিল। এ কারণে তাঁর ভয় ছিল, কেউ তাকে চিনে ফেললে কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সামনে সে যখন বাইয়াত গ্রহণ করতে এসেছিল, তখন তাঁর ভেতরে কোন নমনীয়তা ছিল না। তারা যে আজ পরাজিত, এ ধরণের কোন মনোভাব তার ভেতরে ছিল না। রাসূলের সাথে তাঁর কথাবার্তাও ভদ্রজনোচিত ছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'বলো, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশী স্থাপন করবে না।'

জবাবে হিন্দা বলেছিল, 'আপনি এ ধরণের অঙ্গীকার পুরুষদের কাছ থেকে আদায় করেননি। কিন্তু আমি সে অঙ্গীকার আপনার কাছে করছি।'

আল্লাহর নবী তাকে বললেন, 'অঙ্গীকার করো, কোনদিন চুরি করবে না।' আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বলেছিল, 'আমি আমার স্বামীর অর্থ সম্পদ থেকে মাঝে মধ্যে কিছু এদিক-ওদিক করে থাকি। আমার জানা নেই এগুলো হারাম না হালাল।' আল্লাহর রাসূল বলেছিলেন, 'বলো, সন্তানদের হত্যা করবে না।' হিন্দা বলেছিল, 'আমরা বহু কষ্ট করে বাচ্চাদের লালন-পালন করে বড় করেছিলাম। আপনি বদরের প্রান্তরে তাদেরকে হত্যা করেছিলেন। এখন আপনি এবং তারা যা উত্তম তাই বুঝবেন।'

প্রিয় চাচা হামজাকে হত্যা করেছিল ওয়াহ্‌শী। আর তাঁর বুক চিরে যে নারী কলিজা চিবিয়েছিল, দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে মালা বানিয়ে গলায় পরিধান করেছিল যে নারী, সেই নারী আল্লাহর নবীর সামনে। শুধু সামনেই নয়, নবীকে অভিযুক্ত করে গর্বভরে কথা বলছে সেই নারী। ধৈর্যের পাহাড় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কিছুই বললেন না। ইসলাম হুমকি-ধমকি দিয়ে প্রসারিত হয়নি, ক্ষমা আর প্রেম দিয়েই ইসলাম দিকদিগন্তে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

মক্কায় এমন দশজন লোক ছিল, যারা ছিল কুরাইশদের বিখ্যাত নেতা। ইসলামের বিরোধীতার ক্ষেত্রে তাদের নাম স্মরণীয় হয়েছিল। তারা মক্কা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

হযরত ওমায়ের ইবনে ওহাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রাসূলের সামনে এসে নিবেদন করলেন, 'আরবের নেতৃবৃন্দ নিরাপত্তার অভাবে মক্কা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাচ্ছে।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র পাগড়ী মোবারক দিয়ে দিলেন। যা ছিল নিরাপত্তার প্রতীক। অভয় দান করলেন, তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই।

## তাবুক অভিযান

আরব দেশকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার অভিলাষ রোমকদের বহু দিনের। বিশেষ করে উদিয়মান মুসলিম শক্তিকে রোমের খৃষ্টানরা ভয়ের চোখেই দেখছিল। গোটা আরব যখন ইসলামের ছায়াতলে এসে গেল, তখন রোমের খৃষ্টান শাসক বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপরে আধিপত্য বিস্তারের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ইয়াহূদীরাও তাকে আরবের ওপরে আক্রমন করে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার লক্ষ্যে উস্কানী দিয়ে যাচ্ছিল। তারপর মূতার যুদ্ধে তাদের শোচনীয় পরাজয় তাদেরকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। এ জন্য প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে রোমের সম্রাট হোরাক্লিয়াস মুসলমানদের বিরুদ্ধে লক্ষাধিক সৈন্য প্রেরণ করেছিল।

মদীনা এবং সিরিয়ার মাঝখানে তাবুক প্রান্তর অবস্থিত। সিরিয়ায় সে সময় গাচ্ছানী বংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। তারা ছিল রোমকদের আশ্রিত। রোম সম্রাট এদেরকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজে লাগালো। সিরিয়ার নাবতী বংশের লোকজন মদীনায় যয়তুন তেলের ব্যবসা করতো। তারা এসে মদীনায় জানিয়েছিল, 'রোম সম্রাট এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের ওপরে আক্রমন করার জন্য যাত্রা করেছে। আরবের খৃষ্টান গোত্রসমূহ তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। তাদের বাহিনীর প্রথম ভাগ বলকা নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।'

রোমকদের যুদ্ধ যাত্রার এত উৎসাহের পেছনে খৃষ্টানদের একটা ভিত্তিহীন সংবাদ ক্রিয়াশীল ছিল। আরবের খৃষ্টান নেতৃবৃন্দ রোমের সম্রাট হোরাক্লিয়াসের কাছে একটা মিথ্যা সংবাদ দিয়ে পত্র প্রেরণ করেছিল। তারা লিখেছিল, 'আরবের নবী মুহাম্মাদ ইন্তেকাল করেছে। গোটা আরবের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে ফলে প্রতিদিন মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে। আরব জয় করার এখনই উপযুক্ত সময়।'

আল্লাহর নবী বাধ্য হয়েই তাদেরকে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য ও দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য যোগাড় হলো। এদের ভেতরে দশ হাজার ছিল অশ্বারোহী। তাবুকের এই যুদ্ধ ছিল আরবের এক চরম দুঃসময়ে। গরমের অবস্থা এমন ছিল যে, গোটা আরব যেন আগুনে ঝলসিত হচ্ছিল। দেশেও চলছিল অভাব অনটন। মানুষের জন্য নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাত্রা

করা ছিল এক কঠিন বিষয়। গাছের খেজুর কাটা সবেমাত্র শুরু হবে। এখনই খেজুর না কাটলে তা নষ্ট হয়ে যাবে। আরবের প্রধান অর্থকরী ফসল হলো খেজুর। এমনিতেই অভাব বিরাজ করছিল, তারপরে যদি খেজুর কেটে ঘরে উঠানো না যায়, তাহলে গোটা বছর অনাহারে কাটাতে হবে। এই অবস্থায় যুদ্ধে গমন করার প্রশ্নই ওঠে না।

তবুও সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে আল্লাহর নবীর আহ্বানে যুদ্ধে বের হয়ে পড়লেন। এই যুদ্ধ ছিল ইসলামী রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার যুদ্ধ। সুতরাং আল্লাহর নবী আরবের সমস্ত মুসলমান এবং মিত্র গোত্রের ভেতরে ঘোষনা করে দিলেন যে, যার যতটুকু ক্ষমতা আছে, সে যেন তাই দিয়ে সাহায্য করে। যুদ্ধ তহবিল খোলা হলো। গোটা আরব থেকে প্রচুর সাহায্য এলো। মদীনার আনসাররা অবারিত হস্তে যুদ্ধ তহবিলে দান করলেন। তাদের মহিলাগণ হাতের চূড়ি, কণ্ঠহার, জমানো অর্থ দান করলেন।

হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বনবী বসেছিলেন আর মদীনার মানুষ তাঁর সামনে নগদ অর্থ ও অলংকার দান করছিলেন। তাঁর সামনে অর্থ এবং অলংকার এতটা উচ্চতা লাভ করেছিল যে, আল্লাহর নবী অর্থ ও অলংকারের স্তুপের আড়াল হয়ে পড়েছিলেন।

হিজরী নবম সালের রজব মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাবুকের দিকে অগ্রসর হলেন। ত্রিশ হাজার পদাতিক আর দশ হাজার অশ্বারোহীর বিশাল এক বাহিনী আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে এগিয়ে চললো। ইতোপূর্বে মুসলমানগণ এতবড় বিশাল বাহিনী নিয়ে আর অগ্রসর হতে পারেনি। বিপদ সঙ্কুল পথ অতিক্রম করে এই বিশাল বাহিনী যখন তাবুকের প্রান্তরে পৌছলো, তখন খৃষ্টানদের বিস্ময়ে হতবাক হবার পালা। কারণ তাদেরকে আরবের খৃষ্টানরা সংবাদ প্রেরণ করেছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জীবিত নেই এবং মুসলমানদের যুদ্ধ করার বর্তমানে কোন ক্ষমতা নেই। এখানে স্বয়ং মুহাম্মাদকে বিশাল এক বাহিনীসহ উপস্থিত হতে দেখে তাদের যুদ্ধ করার বাসনা বাতাসের সাথে মিশে গেল।

মুসলমানদের বাহিনী একের পরে এক আসছেই। এই বাহিনীর যেন শেষ নেই। খৃষ্টানরা মুসলমানদের দুর্বল ভেবে আক্রমনের পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু মুসলমানরা দুর্বল কোথায়? তারা সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শত শত মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করে যুদ্ধ করতে উপস্থিত হয়েছে। এদের ৩১৩ জন যোদ্ধার সাথে যুদ্ধ করে কুরাইশরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছে। মূতার প্রান্তরে মাত্র ৩০০০ সৈন্য তাদের ত্রিশ

হাজার সৈন্যকে পর্যদুস্ত করেছে। আর আজ স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেনাপতি হিসাবে অগণিত বাহিনী নিয়ে উপস্থিত। মুহাম্মাদ ইশারা করা মাত্র এই বাহিনী প্রাণ দান করবে নতুবা বিজয় অর্জন করবে। সুতরাং কোন ক্রমেই এদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ পৌছে গেল। ভয়ে সে এবং তার বাহিনী সিরিয়া ত্যাগ করে হিমসে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তাবুকের আশে পাশের খৃষ্টান শাসকগণ ভয়ে প্রাণহীনের মত হয়ে পড়েছিল। বিশ্বনবী তাদেরকে কিছুই বললেন না। তাদেরকে কোন কিছুই বলতে হলো না। স্বয়ং তারাই দলে দলে এসে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আর যারা নিজের ধর্মের ওপরে বহাল থাকলো, তারা আল্লাহর নবীর সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হলো। সন্ধির শর্তে উল্লেখ করা হলো, তারা সব ধরণের স্বাধীনতা ভোগ করবে। শুধুমাত্র বছরে সামান্য কর দান করবে।

## আল্লাহর নবীর শেষ হজ্জ

এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহ মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শন করার জন্য যে সমস্ত নবী এবং রাসূল প্রেরণ করেছিলেন, তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। দায়িত্ব পালন করার পরে তাঁরা এই পৃথিবীতে অতিরিক্ত সময় অবস্থান করবেন কুদরতের এটাই ছিল নিয়ম। পৃথিবীর জীবন হতে তাদের কাছে ঐ পবিত্র জগৎ ছিল অধিক প্রিয়। ঐ জগতে মহান আল্লাহর সাথে মিলিত হবার জন্য তাঁরা ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। কোন নবীকে যখন আল্লাহর সাথে মিলিত হবার কথা জানানো হয়েছে, তাঁরা এতটুকুন দ্বিধা না করে অতিদ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে যে দায়িত্ব দান করা হয়েছিল, তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করলেন। এমন লোক যখন প্রস্তুত হয়ে গেল, যে লোকগুলো স্বেচ্ছায় অন্তরের তাগিদে আল্লাহর বিধান সমুন্নত রাখবে, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনে নিজের জান-মাল কোরবান করবে, যে কোন ত্যাগ স্বীকার করবে, তখন মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধুকে নিজের সান্নিধ্যে গ্রহণ করার ইচ্ছা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিলেন।

তিনি হিজরতের পরে ফরজ হজ্জ আদায় করার সুযোগ পাননি। দশম হিজরীতে তিনি তাঁর জীবনের শেষ হজ্জ আদায় করার নিয়ত করলেন। জিলকদ মাসে ঘোষনা করা হলো আল্লাহর নবী হজ্জ আদায় করতে যাবেন। এই ঘোষনা গোটা আরবে

বাতাসের গতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। দূরে অবস্থানরত মুসলমানগণ যখন জানতে পারলেন, আল্লাহর নবী এই বছর হজ্জ আদায় করতে যাবেন। যার সামান্য সামর্থও আছে, সে ব্যক্তিও হজ্জ আদায় করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তাছাড়া এমন অনেক গোত্র ছিল, যারা সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহর নবীকে দেখার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। হজ্জ আদায় করতে গেলে নবীকে দেখা যাবে, এ কারণেও অনেকে এবারের হজ্জে যোগদান করার জন্য প্রস্তুত হলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জিলকদ মাসের শনিবারের দিন গোসল করে তহবন্দ এবং চাদর পরিধান করলেন। যোহরের নামায আদায় করে তিনি মদীনা থেকে বের হলেন। পবিত্রা স্ত্রীদেরকে এবার তিনি সাথে নিলেন।

মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে জুল হুলাইফা নামক স্থানে এসে প্রথম রাত অতিবাহিত করলেন। এই স্থান থেকেই মদীনাবাসী হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। তিনি এখানে গোছল করলেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নিজের হাতে প্রিয় নবীর পবিত্র শরীর মোবারকে আতর মাখিয়ে দিলেন। তারপর দুই রাকায়াত নামায আদায় করে উটের ওপর আরোহণ করে হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। ইহরাম বেঁধেই তিনি বিনয় অবনত চিত্তে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত হয়েছি! হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত হয়েছি! হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত হয়েছি এবং ঘোষণা করছি, তোমার কোন অংশীদার নেই। হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত হয়েছি! নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা এবং নিয়ামত তোমারই জন্য নির্দিষ্ট এবং আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র তোমারই জন্য, তোমার কোন অংশীদার নেই।

কাফেলা এক সময় এসে সরফ নামক স্থানে উপনিত হলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেখানে যাত্রা বিরতি করে গোছল করলেন। তারপর তিনি জিলহজ্জ মাসের চার তারিখে ফজরের নামাযের সময় পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করলেন। মদীনা থেকে মক্কায় পৌছতে তাঁর নয় দিন সময় লেগেছিল।

আল্লাহর নবী মক্কায় এসেছেন, এ সংবাদ শোনার পরে দলে দলে মুসলমানরা তাঁকে অভ্যর্থনা করতে বের হয়ে এসেছিল। বিশেষ করে তাঁর নিজের গোত্র বনী হাশেমের শিশুরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাস্তায় বের হয়ে এসেছিল। আল্লাহর নবী শিশুদেরকে ভালোবাসতেন। তিনি কোন শিশুকে নিজের উটের পেছনে বসিয়ে নিলেন, কোন শিশুকে উটের সামনে বসিয়ে নিলেন। তিনি এগিয়ে গেলেন কা'বার দিকে। কা'বার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তিনি আল্লাহর কাছে বললেন, 'হে আল্লাহ! এই ঘরের সম্মান মর্যাদা আপনি বৃদ্ধি করে দিন।'

এরপর তিনি কা'বা তাওয়াফ করলেন। মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে দু'রাকায়াত নামায আদায় করলেন। তারপর সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ে পৌছে বললেন, 'সাফা

এবং মারওয়া পাহাড় আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত।' এখানে দাঁড়িয়ে কা'বা ঘরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আল্লাহ্ ব্যতীত দাসত্ব লাভের উপযোগী কেউ নেই। কেউ তাঁর অংশীদার নেই। সমস্ত ক্ষমতা তাঁরই, তাঁরই জন্য সমস্ত ক্ষমতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রশংসা। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। সমস্ত কিছুর ওপরে তিনিই শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। আল্লাহ নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন এবং নিজের বান্দাকে সাহায্য করেছেন, সমস্ত গোত্রকে পরাজিত করেছেন।'

আরববাসীরা হজ্জের সময় ওমরাহ্ করতো না। সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করে তিনি সায়ী শেষ করলেন। তারপর যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিল তাদেরকে তিনি ইহরাম হতে মুক্ত হবার নির্দেশ দিলেন।

কুরাইশরা একটা প্রথা বানিয়ে নিয়েছিল যে, তারা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ ধারণা করে অন্য হাজিদের মত আরাফাতে অবস্থান না করে মুজদালিফায় অবস্থান করতো। এই মুজদালিফা ছিল কা'বা শরীফের সীমানায় অবস্থিত। তারা হজ্জের সময় কা'বার সীমানা অতিক্রম করতো না এ কারণে যে, অন্যদের ভেতরে আর তাদের ভেতরে তাহলো তো আর কোন পার্থক্য থাকবে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই কু-প্রথার কবর দিলেন। তিনি সমস্ত বিভেদ এবং অহংকারের মাথায় পদাঘাত করলেন। তিনি সাধারণ হাজীদের সাথে আরাফাতে গমন করে ঘোষনা করলেন, 'তোমরা নিজেদের পবিত্র স্থানসমূহে অবস্থান করো। কারণ তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষ ইবরাহীমের উত্তরাধিকারী হিসাবে পরিচিত।'

## বিদায় হজ্জের ভাষণ

আরাফাতে অবস্থান করা হযরত ইবরাহীমের পবিত্র স্মৃতির সাথে জড়িত। তিনিই এই স্থানকে হাজিদের অবস্থানের জন্যই নির্বাচন করেছিলেন। এই স্থানের একটা জায়গার নাম হলো নামিরাহ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এখানে অবস্থান করলেন এবং সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরে তিনি আরফাতের ময়দানে গমন করলেন। এই ময়দানেই তিনি তাঁর উটনী কাসওয়ার ওপরে বসে বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষন দিয়েছিলেন।

আল্লাহর নবী বললেন, 'হে জনমন্ডলী! আজ আমি তোমাদেরকে যে কথা বলবো তা মনোযোগ দিয়ে শুনো। আমার ধারণা, আর বোধহয় তোমাদের সাথে একত্রে হজ্জ করার সুযোগ নাও হতে পারে। জেনে রেখো, জাহিলিয়াতের যুগের সমস্ত অন্ধ বিশ্বাস

এবং প্রথা, অনাচার, কুসংস্কার আমার পায়ের নীচে দলিত মথিত হলো। অজ্ঞতার যুগের রক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ আজ থেকে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। আমি সর্বাগ্রে আমার বংশের রাবিয়া ইবনে হারিসের রক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ রহিত করলাম। সে যুগের সুদ প্রথাও রহিত করলাম। আমি প্রথমে আমার বংশের আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদের দাবী নাকচ করে দিলাম।

(আরবে প্রথা ছিল, কেউ কাউকে নিহত করলে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেই হবে। এই প্রতিশোধের পালা বংশ পরম্পরায় চলতো। রাবিয়া ইবনে হারিসের সন্তান আরেক গোত্রের হাতে নিহত হয়েছিল। বিচারের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু নিজেরা আইন হাতে উঠিয়ে নিতে পারবে না। আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালিবের সুদের ব্যবসা ছিল। তিনি অর্থ ধার দিয়ে সুদ আদায় করতেন। তখন পর্যন্ত আরবের অনেক লোকের কাছেই তিনি সুদের অর্থ পেতেন)

একজন অপরাধ করলে আরেকজনকে শাস্তি দেয়া তথা পিতার অপরাধের কারণে সন্তানকে বা সন্তানের অপরাধের কারণে পিতাকে কোন শাস্তি দেয়া যাবে না। (এই নিষ্ঠুর প্রথা সে সময় সারা আরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অপরাধীকে ধরতে না পারলে তার নির্দোষ আত্মীয়কে শাস্তি দেয়া হত) যদি কোন নাক কাটা হাবশী গোলামকেও তোমাদের নেতা নির্বাচন করা হয় এবং সে যদি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে, তাহলে তোমরা তাঁর আনুগত্য করবে। তাঁর নির্দেশ পালন করবে।

সাবধান! দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘন করো না। এই সীমা লংঘনের কারণে অতীতে বহু জাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। মনে রেখো, তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে এবং সমস্ত কর্মের হিসাব তাঁর কাছে দিতে হবে। সাবধান! আমার পরে তোমরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে কাফেরদের মত একে অপরের রক্তপাত করো না। সাবধান! তোমাদের পরস্পরের ধন-সম্পদ পরস্পরের কাছে আজকের পবিত্র দিনের মত, এই পবিত্র মাসের মত এবং এই পবিত্র মক্কার মতই পবিত্র।

জেনে রেখো, আরবদের ওপরে অনারবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অনারবদের আরবদের ওপরে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সবাই আদমের সন্তান আর আদম হলো মাটি থেকে সৃষ্টি। মনে রেখো, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই এবং সমস্ত মুসলমানদের নিয়ে একটা অবিচ্ছেদ্য সমাজ। হে মানুষ! আমার পরে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। তোমাদের পরে আর কোন নতুন উম্মত সৃষ্টি হবে না। এই বছরের পরে তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ত আর হবে না। সুতরাং জ্ঞান অপৃত হবার পূর্বেই আমার কাছে হতে শিক্ষা গ্রহণ করো।

বিশেষ করে চারটি কথা ভালো করে স্মরণ রেখো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। ন্যায়ের ভিত্তি ব্যতীত তোমরা কাউকে হত্যা করো না। অপরের দ্রব্য আত্মসাৎ করো না। ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না। আমি তোমাদের কাছে যা রেখে যাচ্ছি, তা দৃঢ়ভাবে ধারণ যদি করে রাখো, তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব এবং আমার প্রদর্শিত পথ রেখে যাচ্ছি। (অর্থাৎ রাসূলের সুন্নাত)

হে উপস্থিত জনমন্ডলী! শয়তান হতাশ হয়েছে। কারণ আরবে সে আর কোনদিন পূজা লাভ করবে না। কিন্তু সাবধান! তোমরা যাকে ছোট মনে করো, তার ভেতর দিয়েই শয়তান তোমাদের মহাক্ষতি সাধন করে। তোমরা এ সম্পর্কে সতর্ক হও। নারীদের সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করছি, তাদের সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করার ব্যাপারে আল্লাহর আযাবকে ভয় করো। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর জিম্মাদারীতে গ্রহণ করেছো। আল্লাহর নির্দেশের আওতায় তোমরা নিজেদের জন্য তাদেরকে বৈধ করে নিয়েছো। তোমাদের স্ত্রীর ওপর যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে, তেমন তাদেরও তোমাদের ওপর অধিকার রয়েছে। মনে রেখো, তোমরাই তাদের আশ্রয়।

আমি তোমাদেরকে তোমাদের দাস-দাসী সম্পর্কে সাবধান করছি। তাদের ওপরে কোন ধরণের নির্যাতন করবে না। তাদের সাথে এমন ব্যবহার করো না যে, তারা মনে আঘাত পায়। তোমরা যা আহার করবে, তোমরা যা পরিধান করবে তাদেরকেও তাই আহার করাবে এবং তাই পরিধান করাবে। তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছো, আমার কাছে থেকে যা শুনলে, যারা উপস্থিত নেই তাদের কাছে তা পৌঁছে দিও। তাদের ভেতরে কেউ কেউ শ্রোতাদের থেকেও অধিক স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন ও বোধ শক্তি সম্পন্ন হতে পারে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ভাষন একত্রে পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। কারণ যিনি যতটুকু শুনেছেন এবং স্মরণ রাখতে পেরেছেন, ততটুকুই তিনি বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন হাদীসে ভাষনের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর নবীর ভাষন একত্রে সমস্ত মানুষ শুনতে পায়নি। কারণ বর্তমান সময়ের মত সে যুগে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ছিল না। এ কারণে বিভিন্ন স্থানে ঘোষক নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁরা রাসূলের ভাষন উপস্থিত মানুষকে জানিয়ে দিচ্ছিলেন।

এরপর আল্লাহর নবী আরাফাত এবং মিনায় উপস্থিত মানুষদের লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি আমার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছি কিনা, এ সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন। তখন তোমরা কি জবাব দিবে?'

লক্ষ মানুষের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন, আল্লাহর বাণী আপনি আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর কাছে এই সাক্ষ্য দিবো।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর অর্পিত এই দায়িত্ব পালন করছিলেন, তখন মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দিলেন, আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে কবুল করে নিয়েছি। (সূরা মায়েদা-৩)

এরপর আল্লাহর নবী হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে আযান দিতে বললেন। তারপর যোহর ও আসরের নামায এক সাথে আদায় করলেন। নামায শেষ হলে তিনি নিজের অবস্থানের কাছে এসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। তারপর সূর্য অস্ত গেলে তিনি যাত্রা করলেন। এ সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উটনীর পেছনে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বসেছিলেন। বিশাল এক জনসমুদ্রের মাঝ দিয়ে তিনি আসছিলেন। হাতের ছড়ি দিয়ে তিনি ইশারা করছিলেন আর মৃদুকণ্ঠে বলছিলেন, 'হে জনমন্ডলী! শান্তির সাথে।'

বারবার এই কথাটি বলছিলেন। অর্থাৎ কোন বিশৃংখলা যেন না হয়। পথে এক সময় তিনি পবিত্রতা অর্জন করলেন। হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁকে জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! নামাযের সময় শেষ হয়ে আসছে।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জানালেন, 'নামায আদায়ের জায়গা সামনে আসছে।'

আল্লাহর নবী মুজদালিফায় এসে মাগরিবের নামায আদায় করলেন। তারপর মানুষজন নিজেদের তাঁবুতে গিয়ে উপস্থিত তাদের জিনিষ পত্র খুলবে, এমন সময় এশার নামাযের আযান হলো। অর্থাৎ মাগরিবের নামায এবং এশার নামাযের ভেতর সময়ের তেমন ব্যবধান ছিল না। সেদিন রাতে আল্লাহর নবী বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য রাতের মত রাত জেগে নামায আদায় বা আল্লাহর কাছে সিজদা দিয়ে থাকা, এমন করেননি। হাদীস বিশারদগণ বলেন, এই একটি মাত্র রাতই আল্লাহর নবী তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেননি।

ইতোপূর্বে কুরাইশরা সূর্য ওঠার পরে মুজদালিফা ত্যাগ করতো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সে প্রথা রহিত করে সূর্য উদিত হবার পূর্বেই মুজদালিফা ত্যাগ করলেন। এ সময় তাঁর সাথে তাঁর চাচাত ভাই হযরত ফজল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন। এই দিনটি ছিল জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ শনিবার। তারপর তিনি মীনায় জামরার কাছে উপস্থিত হয়ে কিশোর বালক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে পাথর কুড়িয়ে এনে দিতে বললেন। তিনি পাথর এনে দিলে আল্লাহর নবী পাথর নিক্ষেপ করলেন।

এরপর তিনি কোরবানীর দিকে গেলেন। তিনি বললেন, 'কোরবানীর জন্য শুধুমাত্র মীনাই নয়, মক্কার যে কোন স্থানেই কোরবানী হতে পারে।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে একশত উট ছিল। কিছু উট তিনি নিজ হাতে জবেহ করলেন, বাকীগুলো জবেহ করার জন্য হযরত আলীকে আদেশে দিলেন। উল্লেখ্য, আল্লাহর নবী যখন মদীনা থেকে যাত্রা করেন, তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন ইয়েমেনে। তিনি ইয়েমেন থেকে মুসলমানদের একটি বিশাল দল নিয়ে মক্কায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি এ আদেশও দিলেন, এর গোস্তসহ সমস্ত কিছুই যেন বন্টন করে দেয়া হয়। কশাইকে অন্য খাত থেকে যেন মজুরী দেয়া হয়।

তারপর তিনি মাথা মুড়ালেন। পবিত্র চুল মোবারক তাঁর নির্দেশে মুসলমানদের ভেতরে বন্টন করা হলো। এরপর তিনি মক্কায় গিয়ে কা'বাঘর তাওয়াফ করলেন এবং জমজমের পানি পান করলেন। পানি পান করার পূর্বে তিনি নিজের বংশের লোকদেরকে ডেকে বললেন, 'আমার যদি এই ভয় না হত যে, আমাকে এমন করতে দেখে লোকেরা তোমাদের হাত থেকে বালতি কেড়ে নিয়ে পানি উঠিয়ে পান করবে, তাহলে আমি নিজ হাতে পানি উঠিয়ে পান করতাম।'

হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পানি উঠিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহর নবী কেবলার দিকে দাঁড়িয়ে পানি পান করেছিলেন। এরপর সেখান থেকে মীনায় গিয়ে যোহরের নামায আদায় করেছিলেন। তবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন মক্কাতেই যোহরের নামায আদায় করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হজ্জ আদায় করলেন। তিনি তাঁর উম্মতদেরকে বারবার দেখছিলেন এবং শেষ বারের মতই করুণ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'বিদায়! বন্ধুগণ বিদায়!' এই হজ্জই ছিল দুই জাহানের বাদশাহর জীবনের শেষ হজ্জ।

## জীবনের শেষ ভাষণ

ইন্তেকালের কয়েক দিন পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থ অনুভব করলেন। গোছল করে তিনি হযরত আব্বাস ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমের সাহায্যে যখন মসজিদে পৌঁছলেন, তখন নামাযের জামাত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নামাযের ইমাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অনুভব করতে পারলেন, পরম প্রিয়জন এসেছেন। তিনি ইমামের স্থান থেকে পেছনে সরে আসছিলেন। রাসূল সে স্থানে গিয়ে ইমাম হয়ে নামায আদায় করাবেন। প্রিয় রাসূল তাঁর প্রিয় সাথীকে ইশারা করলেন, সরে আসার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহর নবী হযরত আবু বকরের পাশেই উপবেশন করলেন। হযরত আবু বকর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করলেন। আর সাহাবায়ে কেরাম অনুসরণ করলেন হযরত আবু বকরকে। প্রকারান্তরে সবাই নবীর ইমামতিতে নামায আদায় করলেন। এই নামায আদায় যে কোন্ দিনের যোহরের নামায ছিল, এ সম্পর্কে মত পার্থক্য আছে। মুসলিম শরীফের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, ইন্তেকালের পাঁচদিন পূর্বে অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের দিনের ঘটনা ছিল এটা।

নামায শেষ করে আল্লাহর নবী তাঁর পৃথিবীর জীবনের শেষ দায়িত্ব পালন করলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের সামনে তিনি সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্ব পূর্ণ ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, 'মহান আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন, সে দুনিয়ার জীবনে ভোগ বিলাসকে অগ্রাধিকার দিবে– না আখেরাতের জীবনের অমূল্য নেয়ামতকে প্রাধান্য দিবে। তিনি আল্লাহর কাছে রক্ষিত নেয়ামতসমূহকে প্রাধান্য দিয়েছেন।'

আল্লাহর হাবিবের মুখ থেকে এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। লোকজন তাঁর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন না হযরত আবু বকরের কাঁন্নার হেতু কি। কারণ রাসূল ভিন্ন এক লোকের কথা বললেন যে, সেই লোক আখিরাতের জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু হযরত আবু বকর স্পষ্টই অনুভব করলেন, সেই ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহর নবী।

আল্লাহর নবী বললেন, 'আমি যার সান্নিধ্য লাভ করে সবচেয়ে অধিক উপকৃত হয়েছি, তিনি হলেন আবু বকর। যদি আমি এই পৃথিবীতে কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম তাহলে আমি আবু বকরকেই প্রাধান্য দিতাম। কিন্তু আল্লাহর ইসলামের ভিত্তিতে যে সম্পর্ক স্থাপন হয় সে সম্পর্কই বন্ধুত্বের জন্য যথেষ্ট। শোন, মসজিদের দিকে আবু বকরের ঘরের জানালা ব্যতীত আর কারো জানালা রাখা যাবে না।

তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহ নিজেদের নবী এবং সৎলোকদের কবরকে ইবাদাতের স্থানে পরিণত করেছিল। সেখানে তাদের মূর্তি স্থাপন করেছিল। আমি তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি, তোমরা কখনো এমন করবে না।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ, এ কথা সর্বত্রই প্রচার হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত মানুষের চেহারা যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার ছায়া ঢেকে রেখেছিল। কারো মুখেই হাসি নেই, নেই সে খুশীর উচ্ছাস। তাঁরা যাকে নিয়ে আনন্দ করে, সেই নবী অসুস্থ। আনসারদের প্রতি বিশ্বনবীর অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁরা কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। সংবাদ এলো, আনসারদের ভেতরে কাঁন্নার রোল পড়েছে। হযরত আবু বকর এবং হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম তাদের কাছে ছুটে গেলেন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা এমন করে কাঁদছো কেন?'

তাঁরা জানালো, 'আমাদের প্রতি আল্লাহর নবীর অবদানের কথা স্মরণ করেই আমরা কাঁদছি।' আল্লাহর নবীর কাছে এই সংবাদ গেল যে, তাঁর দুর্দিনের সাথীগণ আনসাররা তাঁর অসুস্থতার সংবাদ শুনে শুধুই কাঁদছে। তিনি সেই দিনের কথা স্মরণ করলেন। এই আনসাররা কিভাবে তাঁকে এবং মক্কার হিজরতকারী মুসলমানদেরকে জীবনের সমস্ত কিছু উজাড় করে দিয়ে সাহায্য করেছে। তিনি যখন ছিলেন আশ্রয়হীন, তখন তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলো।

আল্লাহর নবী রোগাক্রান্ত কণ্ঠে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, 'আমি আনসারদের সম্পর্কে তোমাদেরকে অসিয়ত করে যাচ্ছি, সমস্ত মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করবে। তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না। আহার করার মত বস্তুর ভেতরে যেমন লবনের সংখ্যা কম থাকে। আনসাররা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। এখন তাদের প্রতি তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করবে। আনসারদের সাথে আমার এমন সম্পর্ক যে, দেহের সাথে যেমন হৃদপিন্ডের সম্পর্ক। যে ব্যক্তির হাতে মুসলমানদের সমস্ত কিছুর দায়িত্ব অর্পিত হবে, তাদের দায়িত্ব হলো আনসারদের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্নদেরকে গ্রহণ করা এবং তাদের ভুলসমূহ ক্ষমা করে দেয়া।'

অর্থাৎ মুসলমানদের ভেতরে যিনি খলীফা হবেন, তিনি যেন আনসারদের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেন। তাদের ভেতরে যিনি যে কাজের যোগ্য তাকে সেই কাজ দেন।

আল্লাহর নবী বলেছিলেন, 'হালাল ও হারামের নির্ধারণকে তোমরা আমার ওপরে করো না। মহান আল্লাহ যা হারাম করেছেন, আমি তা হারাম ঘোষনা করেছি। ঐ আল্লাহ যা হালাল ঘোষনা করেছেন, আমি তাই হালাল ঘোষনা করেছি। মানুষের কৃতকর্মের বিনিময় তার নিজের কর্মের ওপরেই নির্ভর করবে।'

এরপর তিনি তাঁর আপন কলিজার টুকরাদের প্রতি আহবান জানিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর নবীর কন্যা ফাতিমা! হে আল্লাহর নবীর ফুফু সুফিয়া! আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবার মত সম্পদ সংগ্রহ করো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে গ্রেফতার হওয়া থেকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবো না।'

## ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় হযরত ওমর (রাঃ)

৬৩৮ সালের ঘটনা। জেরুযালেম মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে এলো। খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একটি সাদা উটের পৃষ্ঠে আরোহণ করে জেরুযালেম নগরীতে প্রবেশ করলেন। বিশাল মুসলিম জাহানের খলীফা– কিন্তু তাঁর চেহারা বা পোষাক দেখে কেউ বুঝতে পারবে না যে, তিনিই দোর্দন্ড প্রতাপশালী খলীফা ওমর। তাঁকে যে বিজয়ী সেনাবাহিনী অনুসরণ করছে, তাঁদের চেহারা বা পোষাক দেখেও বুঝা যাচ্ছে না, এরাই সেই অমিত তেজী বীর তাওহীদের অতন্দ্র প্রহরী মহান আল্লাহর সৈনিক।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন জেরুযালেম নগরীতে প্রবেশ করছিলেন, তখন তাঁর পাশে ছিলো পরাজিত ও আত্মসমর্পণকারী খৃষ্টবাহিনীর প্রধান জেরুযালেম নগরীর শাসক ও সর্বোচ্চ ধর্মযাজক সফ্রোনিয়াস। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জেরুযালেম নগরীতে প্রবেশ করেই গেলেন মসজিদুল আকসায়- যেখানে হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম নামায আদায় করতেন।

এসব স্থান পরিদর্শন শেষে হযরত ওমর ভ্রমন করতে চাইলেন খৃষ্টানদের গির্জাসমূহ। তাঁর উদ্দেশ্যে ছিলো, খৃষ্টানদের এসব গির্জা যুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কিনা তা দেখা। মহান আল্লাহর রহমত– ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মুসলিম বাহিনী কোনো একটি দেশও বিজয় করার পর সেদেশের অমুসলিম নাগরিক বা তাদের ধর্মীয় স্থানসমূহের সামান্যতম ক্ষতি হতেও দেয়নি।

খৃষ্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মযাজক খলীফাকে নিয়ে গেলেন হোলি সেপালকারের গির্জায়। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খৃষ্টানদের প্রধান গির্জা পরিদর্শন করছেন, এমন সময় নামাযের সময় হলো। তিনি নামায আদায় করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই খৃষ্টানদের ধর্ম যাজক আবেদন করলে, তিনি যেন এই গির্জাতেই নামায আদায় করেন। ধর্ম যাজকের প্রস্তাবে মুসলিম জাহানের খলীফা মৃদু হেসে গির্জা থেকে বের হয়ে অন্যত্র নামায আদায় করলেন।

মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র খলীফা– জেরুযালেম নগরীও মুসলমানদের দখলে। তিনি যেখানে খুশী সেখানেই নামায আদায় করতে পারতেন। কিন্তু মুসলমানদের খলীফা তা করলেন না। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হলো, কেন তিনি গির্জায় নামায আদায় করলেন না। জবাবে তিনি বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হয়ে এবং মুসলমনাদের খলীফা হিসেবে তিনি যদি গির্জায় নামায আদায় করতেন, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সাধারণ মুসলমানরা দৃষ্টান্ত হিসেবে এটা উল্লেখ করে বলতো, গির্জা দখল করে নামায আদায় করা যাবে এবং মুসলমানদের অনেকে গির্জা দখল করে মসজিদ বানাতো।

## প্রথম ক্রুসেডের কথা

১০৯৯ সালের ৭ই জুন।

চাঁদ-তারা খচিত ইসলামী পতাকার তখন দুর্দিন, আর সুদিন ক্রস চিহ্নিত খৃষ্টান সম্প্রদায়ের পতাকার। মুসলিম শাসিত জেরুযালেম নগরীকে বেষ্টন করে আছে খৃষ্টান সেনাবাহিনী। দুপুরের দিকে খৃষ্টান সৈন্যরা নগরীর বাইরের একটি স্তম্ভ থেকে নগরীর দেয়াল পর্যন্ত নির্মাণ করলো একটি সেতু। মুসলমানরা অনুভব করলো তাদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়েছে। পালাতে লাগল তারা হারাম শরীফের দিকে যেখানে শেষ প্রতিরোধ হিসেবে ব্যবহারের জন্য রয়েছে 'প্রস্তুত-গুম্বজ' (Dome of the Rock) ও মসজিদুল আকসা। কিন্তু মুসলমানরা সেগুলোকে প্রতিরোধের উপযোগী করে তোলার সময় পেলনা। বাধ্য হয়ে তাঁরা আত্মসমর্পণ করলো খৃষ্টান সেনাবাহিনীর কাছে।

এবার বিজিতের উপর বিজয়ীর আচরণ। খৃষ্টান সৈন্যরা অপবিত্র করে ধ্বংস করে দিল সেই 'প্রস্তর-গুম্বজ'। বিজয়ী মদমত্ত খৃষ্টান ধর্মযোদ্ধাগণ ছুটে গেলো মুসলমানদের ঘরে ঘরে, প্রত্যেক মসজিদে এবং মুসলমানদের ব্যবসা কেন্দ্রে। নির্মমভাবে হত্যা করলো মুসলিম নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সকলকে। কারো পক্ষেই পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হলো না। কারণ সারা নগরী খৃষ্টান বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ। হত্যাযজ্ঞ চললো সারা দিন ও রাত ব্যাপী।

পরের দিন ভোরে একদল খৃষ্টান ধর্মযোদ্ধা শক্তির বলে প্রবেশ করলো মসজিদুল আকসায়। হত্যা করলো সেখানের প্রত্যেক মুসলিমকে এবং ধ্বংস করে দিল সেই পবিত্র মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহ। এরপর খৃষ্টান সেনানায়কগণ গেলেন

মুসলমানদের মসজিদ ও অন্যান্য এলাকা পরিদর্শনে। তাদের যাবার কোনো পথ ছিলো না, সর্বত্র মুসলমানদের লাশ আর লাশ। মুসলমানদের লাশ সরিয়ে তাদের জন্য পথ পরিষ্কার করা হয়েছিলো। তবুও তাদের ঘোগাগুলোর পা হাঁটু পর্যন্ত মুসলমানদের রক্তে লাল হয়ে উঠেছিলো। এভাবেই সেদিন খৃষ্টান প্রধানগণ মুসলমানদের লাশ আর রক্ত মাড়িয়ে বিভিন্ন এলাক পরিদর্শন করেছিলো।

খৃষ্টানরা কোনোদিনই মুসলমানদের সামান্যতম অধিকার সহ্য করেনি, আজও করছে না। সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নত করে যেসব মুসলিমকে গ্রেফতরা করার পর স্বদম্ভে তারা ঘোষণা করছে, 'এসব সন্ত্রাসীর জন্য মানবাধিকারের কোনো বিধান প্রযোজ্য নয়।' তাদের এই আচরণ নতুন কিছু নয়। সেদিন জেরুযালেম নগরী দখল করে মুসলিমদের সাথে যে আচরণ করেছিলো, আজও মুসলমানদের সাথে তারা সেই একই আচরণ করছে।

এরপর খৃষ্টবাহিনী জেরুযালেমের ইয়াহূদীদের বসতি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় স্থানসমূহে ছুটে গেলো। তাদের বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ উত্থাপন করলো, 'তোমরা মুসলমানদের সমর্থন করেছো।' এই অভিযোগে ইয়াহূদীদেরকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। অগনিত ইয়াহূদীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করলো। তাদের বাড়ি-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় স্থানসমূহ ধ্বংস করে দিলো খৃষ্টবাহিনী।

মুসলমানদের আত্মসমর্পণের সমস্ত শর্ত ভঙ্গ করে খৃষ্টানরা হত্যা করেছিল মুসলমানদেরকে ও ধ্বংস করেছিল তাদের মসজিদসমূহ। এই নির্মম ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞের ফলে জেরুযালেম হয়ে গেল মুসলমান ও ইয়াহূদী শূন্য। হত্যা করার জন্য কোন মুসলমান এবং ইয়াহূদী যখন আর অবশিষ্ট রইলো না, তখন খৃষ্টান পাদরী ও ধর্মযোদ্ধারা ভাবগম্ভীর পরিবেশে এক ধর্মীয় মিছিলের আয়োজন করলো। মুসলমানদের লাশ আর রক্ত মাড়িয়ে সেই মিছিল অগ্রসর হলো খৃষ্টানদের হোলি সেপালকার গির্জায় 'গড'-এর কাছে ধন্যবাদ দেয়ার জন্য। এভাবে করে খৃষ্টানরা সেদিন থ্যাঙ্কস গিভিং ডে পালন করেছিলো।

# তৃতীয় ক্রুসেডের কথা

বিজয়ের আনন্দ হিল্লোলে উড়ছে তখন ইসলামের চাঁদ-তাঁরা খচিত নিশান, আর খৃষ্টানদের ক্রস-চিহ্নিত পতাকা পরাজয়ের গ্লানিতে লাঞ্ছিত। ১১৮৭ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর। খৃষ্টান শাসিত জেরুযালেম নগরীর সম্মুখে শিবির স্থাপন করেছেন সিংহ-বিক্রম অধিনায়ক গাজী সালাহ্উদ্দীন। জেরুযালেম নগরীর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দেয়ালের দিকে মুসলিম বাহিনী আক্রমণ করছে।

একমাস পর।

১১৮৭ সালের ২০ শে অক্টোবর। সমগ্র নগরী তখন গাজী সালাহ্উদ্দীনের দয়ার উপর নির্ভরশীল। আত্মসমর্পণের শর্ত স্থির করার জন্য জেরুযালেমের খৃষ্টান-দূত বানিয়ান নিজেই গিয়ে হাজির হলো সালাহ্উদ্দীনের তাঁবুতে। গাজী সালাহ্উদ্দীন বানিয়ানকে জানিয়ে দিলেন, তরবারির সাহায্যেই অত্যাচারী খৃষ্টানদের হাত থেকে জেরুযালেম দখলের শপথ তিনি করেছিলেন। কাজেই শর্তহীন আত্মসমর্পণই তাঁকে মুক্ত করতে পারে সেই শপথ থেকে। ১০৯৯ সালে খৃষ্টান বাহিনী কর্তৃক জেরুযালেমের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন বানিয়ানকে। নীরব বানিয়ান। শেষে শর্তহীন আত্মসমর্পণের শর্তই স্বীকার করে ফিলে গেলো খৃষ্টান দূত বানিয়ান।

সেদিন শুক্রবার, ২৭শে রজব, শবে-মেরাজ। গাজী সালাহ্উদ্দীন প্রবেশ করলেন জেরুযালেমে। অত্যাচারী খৃষ্টানগণ ভয়কম্পিত হৃদয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষামান। কিন্তু মহানুভবতা প্রদর্শন করলেন সিংহ-বিক্রম বিজয়ী বীর গাজী সালাহ্উদ্দীন। খৃষ্টানদের উপর মুসলমানদের বিজয় হয়ে উঠলো মানবিকতার আলোয় উজ্জ্বল। ৮৮ বছর পূর্বে খৃষ্টানরা যেখানে জেরুযালেম নগরীর রাস্তা-পথ মুসলমানদের লাশের পাহাড় আর রক্তের নদী পার হয়ে এগিয়ে গিয়েছিলো হোলি সেপালকার গির্জায়, সেখানে ৮৮ বছর পর মুসলমানদের বিজয়ের দিনে লুণ্ঠিত হলো না খৃষ্টানদের একটি বাড়ি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। স্পর্শ করা হলো না একটি খৃষ্টান গির্জাকেও, আহত হল না একটি মানুষও। গাজী সালাহ্উদ্দীনের আদেশে মুসলমান সৈনিকরা পাহারা দিলো সারা নগরীর রাস্তা-পথ।

নামেমাত্র মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করে দেওয়া হল সকল খৃষ্টান বন্দীকে। যারা সামান্য মুক্তিপণও দিতে পারলো না, পণ ছাড়াই তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হলো। গাজী

সালাহ্উদ্দীন নিজেই ঘোষণা করলেন এই সিদ্ধান্ত। বিনাপণেই মুক্তি দিলেন প্রত্যেক বয়স্ক নর ও নারী বন্দীকে। খৃষ্টান নারীরা যখন অশ্রুসিক্ত চোখে এসে দাঁড়ালো সালাহ্উদ্দীনের সম্মুখে, জিজ্ঞোসা করলো কোথায় তারা যাবে, তাদের স্বামী বা পিতা যুদ্ধে হয় নিহত হয়েছে নয় তো বন্দী হয়েছে। তখন সালাহ্উদ্দীন তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, প্রতিটি বন্দীদের তিনি মুক্ত করে দিচ্ছেন আর প্রত্যেক বিধবা ও ইয়াতিমকে দিচ্ছেন তাদের প্রয়োজন ও মর্যাদা অনুযায়ী জীবন-যাপনের উপরকণ।

গাজী সালাহ্উদ্দীনের এই মহানুভবতা ও অনুগ্রহের বিপরীতে মনে পড়ে ১০৯৯ সালে প্রথম ক্রুসেডের সময় খৃষ্টান বিজয়ীদের নির্মমতম হত্যাকাণ্ডের কথা। বিজয়ের ক্ষণে এই-ই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা। সারা দুনিয়া এই শিক্ষার প্রকাশ দেখেছিল ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা বিজয়ের সময়। (ক্রুসেডের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে History of Crusades,Vol. I &II, Cambridge University Press, London)

ইসলামের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনাও নেই যে, ইসলাম প্রচার বা প্রতিষ্ঠার জন্য কোথাও রক্তপাত করা হয়েছে বা কারো প্রতি শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। অথবা বিজয়ী মুসলিম বাহিনী অমুসলিমদের প্রতি কোথাও সামান্যতম অত্যাচার করেছে। কিন্তু খৃষ্টানদের ইতিহাস মসী লিপ্ত। তারা বিজিত এলাকায় প্রবেশ করেছেই রক্তপাত করতে করতে। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত খৃষ্টান ঐতিহাসিক ডোযি বলেছেন– This appears at first a striking mystery especially when we know that the new religion of Isalm was not imposed on an any body.

অর্থাৎ প্রথমেই দৃষ্টি-আকর্ষণকারী এক রহস্য হিসেবে ধরা পড়ে যে, ইসলামের নতুন ধর্ম কারও উপর জোর করে আরোপ করা হয়নি।

ইসলাম পৃথিবীতে আগমনই করেছে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, কারো প্রতি জোর-জবরদস্তি করার জন্য নয়। ইসলাম জোর-জবরদস্তির বিপক্ষেই অবস্থান গ্রহণ করেছে। ইসলামই পৃথিবীতে একমাত্র আদর্শ, যে আদর্শ অন্যান্য মতবাদ-মতাদর্শ এবং অন্যান্য জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি সহনশীল এবং মুসলিমরাই হলো সবথেকে পরমত সহিষ্ণু জাতি। খৃষ্টান ঐতিহাসিক ডোযি তাঁর 'মুসলমান কর্তৃক স্পেন বিজয়ের বিবরণী'তে উচ্চ প্রশংসা করেছেন ইসলামের এই সহনশীলতার। তিনি বলেছেন–

The state of the Christians under Islam was not the cause

of much discontent if compared with the first. The Muslims were very tolerant, they did not harass any body in matters of religion. For this the Christians were grateful to the Muslims, they praised the tolereance and justice of the Muslim conquerers and preferred the Muslim rule to that of the Germans and Frances.

অর্থাৎ অতীতের সঙ্গে তুলনায় ইসলামের অধীনে খৃষ্টানদের অবস্থায় খুব একটা অসন্তুষ্টির কারণ ছিল না। মুসলমানরা ছিল খুবই সহনশীল, ধর্মের ব্যাপারে তারা কাউকেই হয়রানি করেনি। এর জন্য খৃষ্টানরা মুসলমানদের প্রতি ছিল কৃতজ্ঞ, তারা প্রশংসা করেছে মুসলিম বিজয়ীদের সহনশীলতা ও সুবিচারের এবং জার্মান ও ফ্রান্সদের শাসনের চাইতে অধিকতর পছন্দ করেছে তারা মুসলিম শাসনকে।

প্রত্যেক নবী-রাসূলের ইতিহাসই এ কথা প্রমাণ করে যে, তাঁরা ইসলামের সহনশীলতার নীতির মাধ্যমেই আদর্শের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। সকল নবী-রাসূলের ওপরই অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা কখনোই অসহিষ্ণু পন্থা অবলম্বন করেননি। একই ধারাবাহিকতায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন এবং মুসলমানদেরকেও সেই সহনশীলতার নীতিই শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলাম ও মুসলমানদের এই সহনশীলতা, মানবতা, পরমত সহিষ্ণুতা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের রূপই বিশাল রোম এবং পারস্য সাম্রাজ্য মুসলিমদের পদতলে আনতে সবথেকে বেশী সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলো।

ধর্মের ইতিহাসে অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে যে মানবতা বিরোধী নৃশংসতা ও নির্মমতা দেখা যায়, ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনার গন্ধও পাওয়া যাবে না। ধর্মের নামে যেসব লোমহর্ষক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং ধর্মের নামেই হত্যাযজ্ঞ, নির্মম নিষ্ঠুর দন্ড, শক্তি প্রয়োগ করে শাসন, সম্পদ দখল, নরবলি, কন্যা সন্তান হত্যাসহ যা কিছু অমানবিক কর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে, এসবের কোনো একটি কর্মও ইসলাম অনুমোদন করেনা এবং ইসলাম তার অনুসারীদেরকে এসব কর্ম থেকে কঠিনভাবে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। শক্তি প্রয়োগ করে কাউকে ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে ইসলাম কঠিনভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেছে–

لاَاِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قف قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ–

দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই, প্রকৃত সত্য ও নির্ভুল কথা সুস্পষ্ট এবং ভুল চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গিয়েছে। (সূরা আল-বাকারা-২৫৬)

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আরো বলেছেন-

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ-فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ-

তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যায় ও দ্বীন কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হয়। এরপর যদি তারা বিরত হয় তবে বুঝে নাও যে, কেবলমাত্র জালিমদের ছাড়া আর কারো প্রতি হাত প্রসারিত করা সঙ্গত নয়। (সূরা আল বাকারা-১৯০)

উল্লেখ যে সব ক'টি যুদ্ধেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আত্মরক্ষামূলক ভূমিকায়, তিনি যুদ্ধ করেছিলেন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যারা দূরদেশ থেকে এসে মুসলমানদের নির্মূল করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পবিত্র কোরআন থেকে অনেক দৃষ্টান্তই দেওয়া যায় যে, নিজ মত বা আদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য কারও বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করতে মুসলমানদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। প্রবল অসহনশীলতার সে যুগে গড়ে উঠেছিল পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্যের ভিত্তি ও কাঠামো। সেই যুগে পবিত্র কোরআনের সহনশীলতার নির্দেশাবলী ছিল নিঃসন্দেহে বিস্ময় উৎপাদনকারী। আল্লাহর কোরআন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতিমালা কর্তৃক নির্দেশিত মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে উপলব্ধি করেছিলেন সহনশীলতা ও উদারতার মূল্য এবং তাতে করে সমর্থ হয়েছিলেন বিজিত মানুষ ও সমাজের বিশ্বাস এবং সহানুভূতি অর্জন করা। বিজিত জাতিকে মুসলমানরা দেখিয়ে ছিলেন সহনশীলতা ও দিয়েছিলেন ধর্মীয় স্বাধীনতা।

মুসলমানদের বিশ্বজনীন সহনশীলতার নীতি বিজিত জাতির মনে বন্ধুত্বপূর্ণ ধারণা সৃষ্টিতে পুরোপুরি সফল হয়েছিল এবং তাতে তারা স্বধর্মীদের শাসনের তুলনায় অধিকতর পছন্দ করেছিল মুসলিম শাসনকে। মুসলিম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন সিরিয়ার এক নগরীর বাইরে শিবির স্থাপন করেছিলেন, তখন নগরীর খৃষ্টান অধিবাসীরা মুসলিম সেনাধিনায়কের কাছে আবেদন জানিয়েছিল, 'হে মুসলিমগণ! বাইজেন্টিয়ানরা যদিও আমাদের স্বধর্মী, তবুও তাদের তুলনায় আপনাদেরকে আমরা অধিক পছন্দ করি এজন্য যে, আপনারা আমাদের সঙ্গে

উত্তম শর্ত রক্ষা করে চলেন। আপনারা অধিকতর দয়াশীল ও আমাদের উপর আপনাদের শাসন তাদের তুলনায় উত্তম। কারণ তারা আমাদের সহায়-সম্পদ ও নারীদের সম্মান-মর্যাদা লুণ্ঠন করেছে।'

ইয়ারমুকের সেই বিখ্যাত যুদ্ধের পূর্বে মুসলিম বাহিনী যখন এমেসা নামক এলাকা ত্যাগ করে, তখন এমেসার খৃষ্টান অধিবাসীরা স্বধর্মী হেরাক্লিয়াসের বাহিনী যে নগরীতে প্রবেশ করতে না পারে, এ জন্য তারা নগরীর দরজাসমূহ বন্ধ করে দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে বলেছিলো, এমেসাবাসীরা তাদের স্বধর্মীদের অবিচার ও অত্যাচারের তুলনায় অধিকতর পছন্দ করে মুসলমানদের সরকার ও তাঁদের সুবিচারকে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জেরুযালেম বিজয়ের পর দিয়েছিলেন স্বাধীনতার এক সনদ যাতে উল্লেখ করা হয়েছিল এই ঐতিহাসিক কয়েকটি ধারা। সে সনদে উল্লেখ করা হয়েছিলো, আল্লাহর সেবক, আমিরুল মুমিনীন ওমর নিরাপত্তা দান করেছেন মানুষকে-দান করেছেন তাদের জীবনের নিরাপত্তা, তাদের সহায়-সম্পত্তি, তাদের গির্জাসমূহ, তাদের ক্রুস ও তদসংক্রান্ত তাদের সমস্ত ধর্মের নিরাপত্তা। তাদের গির্জাসমুহ বাসগৃহে পরিণত করা হবে না বা হবে না ধ্বংসপ্রাপ্ত।

খলীফা আল-মুতাসিমের রাজত্বকালে একজন ইমাম ও মুয়াজ্জিন ধ্বংস করে দিয়েছিলেন ইয়াহূদীদের এক মন্দির এবং সেখানে নির্মাণ করেছিলেন একটি মসজিদ। খলীফার কাছে অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি সে-মন্দিরের ধ্বংস করার জন্য ওই ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিয়েছিলেন।

অপরাজেয় মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল আ'স ধ্বংস করে দিয়েছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ায় খৃষ্টানদের সম্মিলিত শক্তি। বিজয়ী সেনাপতি এরপর নিজে গ্রহণ করলেন বিজিত অঞ্চলের শাসনভার। তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে খৃষ্টান প্রজাদেরকে পূর্ণতম স্বাধীনতা দিলেন।

একদিন সকালে নগরীর খৃষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে দেখা দিল তীব্র উত্তেজনা। আর্চবিশপের নেতৃত্বে স্থানীয় খৃষ্টানদের প্রতিনিধি দল উপস্থিত হলেন এসে শাসক হযরত আমরের বাড়িতে। তিনি অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে খৃষ্টান প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানালেন। আর্যবিশপ অভিযোগ করে বললেন, বাজারে স্থাপিত ছিলো যীশুখৃষ্টের মার্বেল পাথরে নির্মিত এক মূর্তি এবং রাতে কেউ ভেঙ্গে দিয়েছে সে

মূর্তির নাক। আমাদের বিশ্বাস যীশুখৃষ্টের মূর্তির নাক ভেঙ্গেছে কোনো মুসলমান। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে আর্চবিশপকে বললেন, যা ঘটেছে তার জন্য আমি গভীরভাবে বেদনাহত ও লজ্জিত। এ কথা সত্য যে ইসলাম অমুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মের ক্ষতি সাধন করার অনুমতি দেয় না। মেহেরবাণী করে আপনারা মূর্তিটি মেরামত করে নিন এবং আমি তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করব।' আর্চবিশপ উত্তর দিলেন যে, ওটা মেরামত করা অসম্ভব, কারণ ওতে একটি নতুন নাক সংযোজন করা যাবে না।' হযরত আমর বললেন, তাহলে তৈরি করুন সম্পূর্ণ নতুন এক মূর্তি এবং তার পুরো খরচ দেব আমি।

আর্চবিশপ জানালেন, এটাও সম্ভব নয়। আপনি জানেন, যীশুখৃষ্টকে আমরা গডের পুত্র হিসেবে বিশ্বাস করি, তাই তাঁর মূর্তি তৈরির জন্য হীন মুসলমানের অর্থ আমরা গ্রহণ করতে পারি না। এর একটিমাত্র ক্ষতিপূরণ করা যেতে পারে; আমরা আপনাদের নবীর মূর্তি বানিয়ে তাঁর নাক ভেঙ্গে দেব।

এ কথা শোনার সাথে সাথে লাল হয়ে উঠল সেনাপতি আমরের সমস্ত মুখমণ্ডল। বার বার তাঁর হাত স্পর্শ করলো নিজ তলোয়ারের হাতল এবং তিনি অস্ত্র থেকে সরিয়ে আনলেন নিজের হাত। বিশপকে বললেন, আপনি প্রস্তাব করেছেন সেই মহান নবীর মূর্তি স্থাপন করে তাঁর নাক ভেঙ্গে দিবেন। অসীম সংগ্রামের পর যিনি উৎখাত করেছিলেন মূর্তিপূজা। আর আপনারা চান আমাদেরই চোখের সম্মুখে সেই নবীর মূর্তি নির্মাণ করে তাঁর নাক ভাঙ্গতে! তার পূর্বে আমাদের সকলের ধ্বংস হয়ে যাওয়াও উত্তম। বিশপ, মেহেরবাণী করে অন্য কোন প্রস্তাব করুন। আপনাদের মূর্তির নাকের বদলে আমাদের যে কারও নাক কেটে আপনাদের হাতে দেওয়ার জন্যও আমি প্রস্তুত।

এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন আর্চবিশপ। পরদিন ভোরে খৃষ্টান ও মুসলিমগণ ময়দানে সমবেত হলো এই দৃশ্য দেখার জন্য। সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার বিবরণ শোনালেন। তারপর তিনি আর্চবিশপকে ডেকে বললেন, আপনি খৃষ্টানদের প্রধান আর এখানে আমি মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রধান। এই দেশ শাসন করার দায়িত্ব আমার। আমার প্রশাসনের দুর্বলতার জন্য আপনার ধর্মের প্রতি যে অবমাননা করা হয়েছে তার শাস্তি গ্রহণ করতে হবে আমাকেই। গ্রহণ করুন এই তরবারি আর আমারই নাক কেটে নিন।

এ কথা বলে তিনি নিজের তরবারি বিপশকে এগিয়ে দিলেন। তরবারি হাতে নিলেন আর্চবিশপ, পরীক্ষা করতে লাগলেন তরবারীর ধার। গভীর বিস্ময়ে অগণিত জনতা নিরব নিস্তব্ধ। চারদিকে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। সহসা নীরবতা ভঙ্গ করে দৌড়ে এলো এক মুসলিম সৈন্য। সে চিৎকার করে বললো, থামুন বিশপ থামুন। এই আপনাদের যীশুর মূর্তির নাক এবং আমিই সেই ব্যক্তি, যে অপরাধ করেছে। শাস্তি আমারই প্রাপ্য। মুসলিম সেনাধিনায়ক সম্পূর্ণ নির্দোষ।

সেই সৈনিক এগিয়ে এলো বিশপের সম্মুখে এবং তরবারির সম্মুখে বাড়িয়ে দিলো নিজের নাক। বিস্ময়-বিমূঢ় জনতা অবাক বিস্ময়ে দেখলো এই দৃশ্য। আর্চবিশপ দূরে নিক্ষেপ করলেন তীক্ষ্ণধার তরবারি এবং বললেন, ভাগ্যবান এই সৈনিক আর ভাগ্যবান এই সেনাধিনায়ক। আর সবার উপরে ভাগ্যবান সে মহান নবী– যাঁর আদর্শে গড়ে উঠেছে এঁদের মতো মানুষ। কোন সন্দেহ নেই যে অন্যায় করা হয়েছে প্রতিমূর্তি ভেঙ্গে, কিন্তু তার চাইতেও বড় অন্যায় হবে যদি মূর্তির নাকের বিনিময়ে কেটে নেওয়া হয় জীবিত মানুষের নাক।

পৃথিবীতে মুসলিম শাসনের সুদীর্ঘকালে অমুসলিম জনসাধারণকে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করানোর জন্য কোন সংগঠিত বা রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা ছিল না এবং খৃষ্ট ও অন্যান্য ধর্মকে উৎপাটিত করার জন্য ছিল না কোন উৎপীড়ন-নিগ্রহ। মুসলিম খলীফা ও সুলতানগণ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা হয়তো অতি সহজেই পারতেন খৃষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মকে নির্মূল করে দিতে, যেমন সহজেই রাজা ফার্ডিনান্ড ও রাণী ইসাবেলা ইসলামকে উৎখাত করতে চেয়েছিলেন স্পেন থেকে। রাজা চতুর্দশ লুই ফ্রান্সে প্রোটেষ্টান্ট ধর্মাবলম্বীদের করেছিলেন শাস্তিযোগ্য এবং ইয়াহুদীদেরকে ইংল্যাণ্ডের বাইরে রেখেছিলেন ৩৫০ বছর। এশিয়া, স্পেন ও দক্ষিন ফ্রান্সসহ বলকানে খৃষ্টীয় গির্জাসমূহের অক্ষত অবস্থায় টিকে থাকা এবং ভারতে হিন্দু মন্দিরসমূহের টিকে থাকাই অমুসলিম প্রজার প্রতি মুসলিম সরকারসমূহের সহনশীল মন-মানসিকতার সবথেকে বড় প্রমান।

## আমি ওমরও সেই মুসলমান

ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি আর রাষ্ট্রের সামান্য একজন নাগরিকের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন মুসলিম জাহানের খলীফার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত, সে সময় তিনি একদিন সরকারী একটি অফিস পরিদর্শনে গেলেন। সেই অফিসে এক খৃষ্টান যুবক কর্মরত ছিলো। যুবকটি খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করে তার চাকরী ক্ষেত্রে প্রমোশনের জন্য খলীফার কাছে আবেদন পত্র পেশ করেছিলো। বেশ কয়েকদিন পর ঘটনাক্রমে ঐ খৃষ্টান যুবকের সাথে খলীফার সাথে সাক্ষাৎ হলে যুবকটি খলীফাকে নিজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জানালো, 'সম্মানিত খলীফা! আমি সেই খৃষ্টান যুবক, আপনার কাছে আমি আমার চাকরীতে প্রমোশনের জন্য আবেদন করেছিলাম।'

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও স্বহাস্যে যুবককে উত্তর দিলেন, 'ওহে যুবক! আমি ওমরও সেই মুসলমান, তোমার আবেদন পত্র আমি যথাস্থানে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সাথে সাথে প্রেরণ করেছি। তুমি তোমার প্রাপ্য বুঝে পাবে।'

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা স্বয়ং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ঢাল হারিয়ে গেলো। তিনি অভিযুক্ত করলেন রাষ্ট্রের এক অমুসলিম নাগরিক ইয়াহুদীকে। খলীফা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আদালত খলীফাকে স্বশরীরে আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন পাঠালো। বাদী-বিবাদী আদালতে উপস্থিত হলে আদালত উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। প্রমাণের অভাবে আদালত খলীফা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলাটি খারিজ করে দিয়েছিলেন। উপলব্ধি করার বিষয়, বাদী ছিলেন ইসলামী জাহানের স্বয়ং খলীফা আর বিবাদী ছিলেন সেই রাষ্ট্রের একজন অমুসলিম নাগরিক। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা কোরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক শাসিত রাষ্ট্র ও সমাজে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং সেসব ঘটনা ইতিহাসের পাতায় সোনালী অক্ষরে দেদিপ্যমান রয়েছে।

এই ধরনের একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এককভাবে কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী সংগঠনের। দেশ ও সমাজের তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত সেই আদর্শবাদী সংগঠনের পক্ষেই সম্ভব কোরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বস্তরের জনশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা। আর সেই সংগঠন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এমন একটি গঠনতন্ত্র প্রয়োজন, যে

গঠনতন্ত্রের আলোকে গোটা সংগঠন নিয়মতান্ত্রিকভাবে যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত করবে। সংগঠনের প্রত্যেক স্তরে আদর্শিক প্রশিক্ষণ, সকল স্তরের জনশক্তির মধ্যে আদর্শ অনুসরণের নিষ্ঠা, আদর্শ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য, শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং সেই সাথে সংগঠনের আওতায় রাষ্ট্র ও সমাজ দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার বাস্তবসম্মত কর্মসূচী ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

## কোর্টে একটি মামলাও হলো না

এ কথা মানব জাতির ইতিহাসে প্রমাণিত সত্য যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা জীবন বিধান অনুসারে এই পৃথিবীতে যে মানব গোষ্ঠীই জীবন পারিচালিত করেছে, তারাই শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও সফলতা অর্জন করেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে যেখানেই আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা হয়েছে, সেখানেই খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। রাষ্ট্র ও সমাজ যাবতীয় অনাচার, বিপর্যয়, অশান্তি ও অকল্যাণ থেকে সুরক্ষিত থেকেছে। আর যেখানেই আল্লাহর বিধানের প্রতি অবজ্ঞা-অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে, অমান্য বা বিরোধিতা করা হয়েছে, সেখানেই সার্বিকভাবে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় ধেয়ে এসেছে।

সুতরাং এ কথা ইতিহাসে প্রমাণিত সত্য যে, একমাত্র ইসলামী জীবন বিধানই মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি ও সফলতার একমাত্র গ্যারান্টি এবং মানব রচিত কোনো প্রকার মতবাদ-মতাদর্শ মানুষের জীবনে শান্তি, স্বস্তি, কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার শোচনীয় স্বাক্ষর রেখেছে। মানব জাতির প্রত্যেকটি বিপর্যয়ের বাঁকেই আল্লাহর বিধান অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিকভাবে অনুভূত হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। অতএব সার্বিক বিবেচনায় রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার নেতৃত্ব আল্লাহভীরু জ্ঞানী-গুণী মুসলিম কর্তৃক পরিচালিত হতে হবে। এই ধরনের রাষ্ট্রে মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক যোগ্যতা সম্পন্ন ও আল্লাহভীরু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে পরামর্শ পরিষদ বা মাজলিশে শূরা বর্তমান থাকবে এবং এই পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালিত হবে।

একমাত্র এই ধরনের রাষ্ট্র ও সমাজই দেশের জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে সক্ষম। কোরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক এই ধরনের ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে অবলম্বিত হওয়ার কারণেই খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতকালে রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র

অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতি, দুষ্কৃতি তথা যাবতীয় অপরাধ থেকে মুক্ত ছিলো। সর্বত্রই সততা আর ন্যায়-নীতির চিহ্ন ছিলো আকাশের প্রজ্জ্বল সূর্যের মতোই স্পষ্ট। খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর খেলাফতকালে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো। পরবর্তী অবস্থা ইতিহাসে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

فَمَكَثَ عَامًا كَامِلاً وَلَمْ يَخْتَصِمْ اِلَيْهِ اثْنَانِ فَقَالَ عُمَرُ- (رضـ) مَا حَاجَةُ بِىْ عِنْدَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ -صَلّى اللّٰهِ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللّٰهُ

দীর্ঘ একটি বছর তিনি সেই পদে অবস্থান করলেন, কিন্তু একটি মামলা-মোকদ্দমাও তাঁর কাছে এলো না। তিনি খলীফার কাছে অনুযোগের সুরে বলেছিলেন, 'দীর্ঘ একটি বছর যাবৎ দেশের প্রধান বিচারপতির পদে আসীন রয়েছি, অথচ একটি মামলাও আমার কাছে এলো না। হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! মুমীন লোকদের জন্য আমার মতো বিচারকের কোনো প্রয়োজন নেই।'

খলীফা জানতে চাইলেন, 'বিশাল একটি দেশের বিপুল সংখ্যক জনতার পক্ষ থেকে একজন নাগরিকও দীর্ঘ এক বছরেও কারো বিরুদ্ধে একটি মামলাও দায়ের করলো না, এর কারণ কি?' জবাবে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন–

دِيْنُهُمُ النَّصِيْحَةُ وَمَنْهَجُهُمُ الْقُرْاٰنُ وَعَمَلُهُمُ الْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَعْرِفُ حَدَّهُ فَيَقِفُ عِنْدَهُ وَ اِذَا مَرِضَ اَحَدُهُمْ عَادُوْهُ وَ اِذَا افْتَقَرَ نَصَرُوْهُ وَ اِذَا احْتَاجَ سَعَادُوْهُ فَفِيْمَا هُمْ يَخْتَصِمُوْنَ اِلَىَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

তাঁদের তথা দেশের জনগণের দ্বীন-ই হলো পরস্পরকে সৎ উপদেশ দেয়া, তাঁদের জীবন চলার নির্দেশক হলো আল-কোরআন এবং তাদের কাজ হলো সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। দেশের প্রত্যেকটি মানুষ জানে তাদের নিজের চলার সীমা রেখা কোন্ পর্যন্ত এবং এজন্য তাঁরা নিজের সীমার কাছে থেমে যায়। তাঁদের মধ্যে কেউ একজন অসুস্থ হলে তাঁরা তাঁর সেবা করে,

কেউ বিপদে নিপতিত হলে তাকে সাহায্য করে এবং কেউ অভাবী হলে তাকে সহায়তা করে। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! তাঁরা কোন্ প্রয়োজনে কেন আমার কাছে বিচারের জন্য আসবে?

উল্লেখিত ঘটনাটির মধ্য দিয়ে সে যুগের সার্বিক অবস্থা প্রতিভাত হয়েছে। সে সময়ে প্রত্যেকটি মানুষ এ কথা অবগত ছিলো যে, জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে কে কতটুকু অগ্রসর হতে পারবে। কোন্ সীমা রেখা অতিক্রম করলে আখিরাতের কঠিন ময়দানে মহান আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করতে হবে, এ কথা তাঁদের হৃদয়ে জাগরুক ছিলো। এ কারণেই তাঁরা পরস্পরের অধিকারের প্রতি সজাগ ছিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খলীফার প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন, তার সারমর্ম হলো, দেশের জনগণ পরস্পরে আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে জীবন পরিচালিত করে, ফলে তাদের মধ্যে কোনো সমস্যাই সৃষ্টি হয় না। তারা পরস্পর ইনসাফের ভিত্তিতে বসবাস করছে। কেউ কারো প্রতি সামান্যতম অবিচার করার প্রবণতাও প্রদর্শন করে না। সুতরাং আদালতে কেউ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না।

খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফত কালে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে আসীন কোনো ব্যক্তির দ্বারা কোরআন-সুন্নাহর একটি বিধানও লংঘিত হয়নি। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আসীন ব্যক্তি থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক স্তর ছিলো ইনসাফের মোড়কে আবৃত। ফলে সেই রাষ্ট্র ও সমাজ একটি পরিপূর্ণ ইনসাফ ভিত্তিক সমাজের ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছিলো। পক্ষান্তরে একনায়কত্ব, রাজতন্ত্র তথা বাদশাহী, স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্র ইত্যাদি পদ্ধতির কারণে দেশের জনগণকে হতে হয় নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও অধিকার বঞ্চিত। প্রত্যেক পদে পদে তাদেরকে অন্যায় আর অবিচারের সম্মুখিন হতে হয়। শক্তিমান কর্তৃক দুর্বল লাঞ্ছিত হবে, এটাই হয় এসব পদ্ধতির অধীনে শাসিত রাষ্ট্রে। জনগণ থাকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এসব কারণেই ইসলামী শরীয়াত উল্লেখিত পদ্ধতির বিপরীতে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় কোরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক শুরাঈ পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন–

وَأَمْرُهُ شُورَى بَيْنَهُمْ–

এবং নিজেদের যাবতীয় কর্মকান্ড পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত করে। (সূরা শূরা-৩৮)

# ঈমান জীবনের বৃত্ত এঁকে দিয়েছিলো

তারীখে তাবারীতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাওহীদের বাহিনী পারস্যের তদানীন্তন রাজধানী মাদায়েনে যখন উপস্থিত হয়েছিলো, তখন সাধারণ সৈন্যবাহিনী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। পারস্য সম্রাটের ধন-রত্ন সংগ্রহ করে একজন হিসাব রক্ষকের কাছে জমা দেয়া হচ্ছিলো। একজন মুসলিম সৈন্য সবথেকে মূল্যবান ধন-রত্নের স্তুপ এনে যখন হিসাব রক্ষকের কাছে জমা দিলো তখন উপস্থিত লোকজন তা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, 'এই লোক যে মূল্যবান ধন-রত্ন এনেছে তা আমরা কখনো দেখিনি। আমাদের সকলের সংগ্রহ করা সম্পদের তুলনায় এই লোকের একার সংগ্রহ করা সম্পদ অধিক মূল্যবান।' এরপর একজন লোক সেই লোককে প্রশ্ন করলো, 'ভাই, তুমি এসব মূল্যবান ধন-রত্ন থেকে কোনো কিছু নিজের জন্য কোথাও সরিয়ে রেখে আসনি তো?'

লোকটি মহান আল্লাহ তা'য়ালার নামে শপথ করে বললো, 'বিষয়টি যদি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সম্পৃক্ত না হতো তাহলে এসব মূল্যবান ধন-রত্ন সম্পর্কে তোমরা কোনো সংবাদই জানতে পারতে না। সবটাই আমি সরিয়ে ফেলতাম।'

লোকজন স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারলো, এই লোক যা বলছে তার একটি শব্দও অসত্য নয়। তাঁর নাম-পরিচয় জানতে চাওয়া হলে সে জানালো, 'আমি আমার নাম ও বংশ পরিচয় প্রকাশ করলে তোমরা আমার প্রশংসা করবে-অথচ প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহরই প্রাপ্য। তিনি যদি আমার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে কোনো বিনিময় দিতে চান, তাহলে আমি তাতেই সন্তুষ্ট।'

কথা শেষ করে লোকটি যখন চলে গেলো, তখন গোয়েন্দাদের মাধ্যমে লোকটির পরিচয় জানা গেলো যে, লোকটি ছিলো আবদে কায়স গোত্রের লোক এবং তাঁর নাম ছিলো আমের।

# ঈমান জাগতিক ভয়-ভীতি দূর করে দিয়েছিলো

তাওহীদের প্রতি ঈমান সাহাবায়ে কেরামের মাথা করেছিলো উঁচু এবং গর্দান করেছিলো উন্নত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো শক্তি তথা রাজা-বাদশাহ্, শাসকগোষ্ঠী, ধর্মীয় নেতৃত্ব বা সমাজের কোনো শক্তিশালী লোকের সামনে তাঁদের মাথা নত হবে–এটা ছিলো তাঁদের কল্পনার অতীত। ঈমানী চেতনা তাঁদের হৃদয় ও দৃষ্টিকে আল্লাহ তা'য়ালার মহানত্ব ও মাহাত্ম্য দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলো। জাগতিক সৌন্দর্য ও আকর্ষণ, পৃথিবীর চিত্তভোলা দৃশ্য ও প্রতারণাকারী বস্তুসমূহ এবং সাজ-সরঞ্জামের প্রদর্শনীর কোনো মূল্যই তাঁদের দৃষ্টিতে ছিলো না। তাঁরা যখন পৃথিবীর শাসকগোষ্ঠীর জাঁক-জমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির এবং তাদের দরবারের সাজসজ্জার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন, তাঁরা দেখতেন–এসব শাসকগোষ্ঠী জাগতিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে পরম তুষ্ট রয়েছে। কিন্তু তাঁদের কাছে মনে হতো, এসব রাজা-বাদশাহ্ যেন মাটির বানানো পুতুল–যাদেরকে মূল্যবান পোষাকে আবৃত করে সিংহাসনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

রাজদরবারে যাতায়াতকারী লোকগুলো যখন রাজা-বাদশাহ্কে সিজ্দা দিতে ব্যস্ত, তখন রাজদরবারে দাঁড়িয়ে এক নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঘোষণা করলেন, 'আমাদের মাথা একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে নত হয় না।'

হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পারস্য সেনাপতি রুস্তমের কাছে দূত হিসাবে হযরত রিবঈ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে প্রেরণ করলেন। তিনি রুস্তমের দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, মহামূল্যবান বস্তু দ্বারা রাজদরবার সজ্জিত, পায়ের নীচের কার্পেট থেকে শুরু করে রুস্তমের দেহের পোষাক ও বসার আসন মহামূল্যবান মণি-মুক্তা দ্বারা সজ্জিত এবং রুস্তমের মাথায় হিরা-জহরত খচিত মুকুট।

অথচ হযরত রিবঈ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পরনে সাধারণ পোষাক, তাঁর সাথে ছোট্ট একটি ঢাল আর বর্শা, মাথায় শিরস্ত্রাণ–দেহ বর্মাবৃত। তিনি রুস্তমের দরবারের সেই মহামূল্যবান গালিচার ওপর দিয়েই নিজের ঘোড়া চালিয়ে রুস্তমের মুখোমুখি হলেন। দরবারের লোকগুলো তাঁকে সামরিক সরঞ্জাম ত্যাগ করে রুস্তমের সামনে যেতে উপদেশ দিলো।

তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, 'আমি তোমাদের কাছে নিজের ইচ্ছায় আসিনি। তোমরাই আমাকে ডেকে এনেছো। আমার অবস্থা যদি তোমাদের দরবারের উপযুক্ত বলে বিবেচনা না করো, তাহলে আমি এখনই ফিরে যাবো।'

রুস্তম তার দরবারের লোকদের বাধা দিয়ে বললো, 'তিনি যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থাতেই আসতে দাও।'

হযরত রিবঈ বর্শার সূচালু অগ্রভাগের ওপর ভর দিয়ে দরবারে বিছানো কার্পেট মাড়িয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন আর তার বর্শার অগ্রভাগের চাপে কার্পেট কয়েক স্থানে ছিদ্র হয়ে গেলো। রুস্তমের লোকজন তাঁকে প্রশ্ন করলো, 'কেন তোমরা আমাদের দেশে এসেছো?

তিনি ঈমান দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমরা মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর গোলামীর দিকে সোপর্দ করার জন্যই এসেছি। পৃথিবীর সঙ্কীর্ণতা থেকে মানুষকে বের করে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে এবং ধর্মের নামে যে জুলুম ও বাড়াবাড়ি চলছে, তা থেকে মুক্ত করে ইসলামের ছায়াতলে টেনে নেয়ার জন্যই এসেছি।'

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান তাঁদের হৃদয়ে এমনই নির্ভীকতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলো–যা ছিলো বিস্ময়কর। আল্লাহর প্রেমে তাদেরকে মশগুল করেছিলো এবং জান্নাতের প্রতি প্রবল আগ্রহশীল আর পৃথিবীর জীবনের প্রতি চরমভাবে বীতস্পৃহ করেছিলো। আখিরাতের জীবন ও জান্নাতের চিত্র তাঁদের দৃষ্টির সামনে এমনভাবে ভেসে উঠতো যে, সেই চিরস্থায়ী শান্তির জীবনে প্রবেশ করার জন্য তাঁরা সামান্য কয়েকটি খেজুর খাওয়ার সময়ও ব্যয় করেননি, দুনিয়ার সমস্ত পিছুটানের প্রতি পদাঘাত করে শত্রু বুহ্যে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাতবরণ করেছেন।

হযরত আবু বকর ইবনে আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আমার আব্বা ছিলেন শত্রু সৈন্যদের মুখোমুখি এবং তিনি ঘোষণা করছিলেন, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত।'

তাঁর ঘোষণা শুনে এমন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো, যাঁর পরনে ছিলো জীর্ণ পোষাক। লোকটি বললো, হে আবূ মূসা! তুমি কি নিজের কানে আল্লাহর রাসূলকে এই কথা বলতে শুনেছো?'

তিনি জানালেন, 'হ্যাঁ, আমি নিজের কানে আল্লাহর রাসূলের মুখ থেকে এই কথা শুনেছি।'

তখন লোকটি নিজের পরিচিতজনদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, 'তোমরা আমার জীবনের শেষ সালাম গ্রহণ করো।' এ কথা বলেই সে তাঁর তরবারির খাপ ভেঙ্গে ফেলে কোষমুক্ত তরবারি হাতে শত্রু বুহ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাতবরণ করলো।

একজন বেদুঈন ঈমান এনে আল্লাহর রাসূলকে বললেন, 'আমি আপনার সাথে হিজরত করতে আগ্রহী।'

খয়বরের যুদ্ধে সে যোগ দিয়েছিলো। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করার সময় আল্লাহর রাসূল সেই বেদুঈনের অংশ পৃথক করে রাখলেন। তাঁকে যখন তাঁর অংশ দেয়া হলো তখন তিনি জানতে চাইলেন, 'এ সম্পদ তাঁকে কেনো দেয়া হচ্ছে?'

তাঁকে জানানো হলো, 'এটা তোমার প্রাপ্য অংশ।' সেই বেদুঈন সম্পদের অংশ হাতে নিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই সম্পদের আশায় ঈমান আনিনি। আমি ঈমান এনেছি যেন আমার কণ্ঠে শত্রুর তীর বিদ্ধ হয়, আমি শাহাতাদবরণ করি এবং জান্নাতে যেতে পারি।'

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আল্লাহর সাথে তোমার চুক্তি যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি তোমার আকাঙ্খা পূরণ করবেন।'

যুদ্ধ শেষে সেই বেদুঈনের লাশ যখন পাওয়া গেলো, তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আল্লাহর সাথে তাঁর চুক্তি সঠিক ছিলো, আল্লাহও তাঁর আশা পূরণ করেছেন।' এসব লোকগুলো ঈমান আনার পূর্বে কী বিশৃঙ্খল জীবন-যাপনই না করছিলো! তাঁরা কোনো নিয়ম-পদ্ধতি, জীবন বিধানের পরোয়া করতো না এবং কোনো শক্তির আনুগত্যও করতো না। তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে যেদিকে পরিচালিত করতো, তারা সেদিকেই ছুটে যেতো। ভ্রান্তির বেড়াজালে ছিলো তারা বন্দী। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার পরে তাঁরা মহান আল্লাহর গোলামীর এক সুনির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করেছিলেন যে, তাঁদের জন্য ঈমান যে বৃত্ত এঁকে দিয়েছিলো, সেই বৃত্তের বাইরে আসা কল্পনারও অতীত হয়ে পড়েছিলো।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী